ঃ প্রথম অধ্যায় ঃ

দেবেশ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন, রচনা।
ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় ও তাঁর
রচিত উপন্যাসের ধারায়
'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ'

প্রথম অধ্যায়

দেবেশ রায় : শৈশব—কিছু স্মৃতি

দেবেশ রায়ের জন্ম ১৯৩৬, ১৭ই ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে। পিতা, ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় (১৯০৫-১৯৬৬)। মাতা অপর্ণা (১৯১২-১৯৯৮)। পিতামহ-উমেশ চন্দ্র রায় (১৮৬৪-১৯৪৪)। ইনি ১৮৮৪ সালে বি.এ পাশ করে বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯১৮ সালে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

মাতামহ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মাতামহী সরলা সুন্দরী (?-১৯৩৯)। ইনি ১৮৯২ সালে প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবে 'এনট্রান্স' পাশ করেন। বিয়ের আগে।

দেবেশ রায়ের স্ত্রী কাকলি রায়, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী। পুত্র দেবর্ষি রায়। ডাক নাম তিতির। 'দেবর্ষি' নামটি দিয়েছিলেন লেখক বন্ধু, বিশিষ্ট লেখক দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখকরা চার ভাই—দিনেশ চন্দ্র রায় (প্রয়াত) , দেবেশ রায়, সমরেশ রায় ও সিদ্ধার্থ রায় (অকাল মৃত্যু)। তিন বোন।

তাঁর শৈশব কেটেছে পাবনার ঐ বাগমারা গ্রামে। "দাদুর বোন রাঙাদিদিমার জমিদার বাড়ি, কারণ তার আগের যে বাড়ি, বাগমারার বাড়ি, সেখানেই আমার জন্ম, হয়ত অবশেষ কিছু মনে লেগে থেকে গেছে—বাড়ির, বাগমারার বাড়ির উত্তর দিকে একটা বেশ উঁচু ঘরের পেছনে খুব বড় বড় গাছে ঘেরা অন্ধকার জলের একটা গোপন পুকুর" ১

তাঁর স্মৃতি কথা মূলক প্রবন্ধ 'জলের মিনার জাগাও' এ তিনি লিখেছেন—"আমাদের গ্রাম ও বাড়ি ছিল যমুনা নদীর পারে। যমুনা ভাঙ্গনের নদী, প্রতি বছরই পার ভাঙত। যে পাড় ভাঙত তার গ্রামের পর গ্রাম যমুনায় চলে যেত, চাষ ক্ষেত থেকে পাকাবাড়ি। বর্ষার আগে বোঝা যেত না যমুনা এবার কোন পাড় ভাঙবে। ব্রহ্মপুত্রের একটা শাখা যমুনা, পাবনা জেলার দক্ষিণ পুবঘেষে পাবনা জিলারই দক্ষিণ পুব বিন্দুতে পদ্মায় পড়েছে। পদ্মা আবার পাবনা জিলার দক্ষিণ পশ্চিম দিয়ে যমুনার দিকে নেমেছে। আমাদের গ্রাম ছিল পাবনার সবচেয়ে পুবে আর পাবনার সবচেয়ে পশ্চিমে ছিল ঈশ্বরদি, সারা, পাকাশি।" ২

সাত বছর বয়সে দেবেশ রায় ওদেশ থেকে জলপাইগুড়িতে চলে আসেন। কাজেই বাংলাদেশ সম্পর্কে তেমন কোনো প্রখর স্মৃতি তাঁর নেই। থাকার কথাও নয়। তাছাড়া অহেতুক 'নষ্টালজিক' হওয়াও তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি লিখেছেন—"পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে আছেন, তাঁরা বাংলাদেশকে এক স্থায়ী

স্মৃতিদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্গত করে নিয়েছেন। আমি নিজেকে এই আবেগগড্ডল থেকে বাঁচাতে চাই।" ৩

সেজন্য বার দুয়েক বাংলাদেশে গিয়েও তিনি দেশে যান নি। তবে কিছু স্মৃতি প্রায় সত্তর বছর বয়সে এই প্রবন্ধ লিখবার সময় পর্যন্ত মনে পড়ে। 'বাগমারার বাড়ির কোনটা সম্মুখ, কোনটা পেছনে সে সব নিয়ে আমার মনে কোন ছবির টুকরোও নেই।' কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে গাছ-গাছালি ঘেরা একটা কাল দীঘি। সেই দীঘির জলে কেউ তাকে নিয়ে গিয়ে আঁজলায় জল তুলে তার চোখে মুখে সাপ্‌টে দিয়ে আঁচলে মুখ মুছিয়ে দিয়েছিল। 'তার আঁচলে একটা গন্ধ ছিল—জলকাদা থেকে বহু ব্যবহৃত কাপড়ে লেগে যাওয়া পুরোনো গন্ধ।' সেই গন্ধও তাঁর স্মৃতিতে রয়েছে।

মনে আছে নদীতে বাড়ি ভেঙ্গে যেতে পারার উদ্বেগে ব্যস্ত দাদুকে, ব্যস্ত বাবাকে, বিপদের সময়ে ধৈর্যশীলা ছিপছিপে গড়ন ঠাকুমাকে, যার এই মহৎগুণ লেখকের মা'ও পেয়েছিলেন তার শাশুড়ির কাছ থেকে।

লেখকের মনে আছে লালচাঁদ দাদাকে, মুসলমান বাড়ির কর্তা স্থানীয় তার ছেলে রমজান যিনি জলপাইগুড়ির বাড়িতেও ছিলেন এবং ভাইদের দেখাশুনা করতেন।

দেবেশ রায়ের স্কুল জীবন ও কলেজ জীবন কাটে জলপাইগুড়িতেই। ১৯৪৩-এ তিনি সাত বছর বয়সে বাগমারার বাড়ি থেকে জলপাইগুড়ি শহরে চলে আসেন। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে ১৯৫২ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন এবং আনন্দ চন্দ্র কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে ১৯৫৬-তে বাংলায় অনার্সসহ বি.এ পাশ করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন এবং ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ পাশ করেন। এরপর আবার জলপাইগুড়িতে ফিরে যান এবং আনন্দ চন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৭৫ সাল, কলকাতায় স্থায়ীভাবে আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা করেন। কলকাতায় এসে নতুন কর্মক্ষেত্র হিসেবে 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স'-এ যোগ দেন।

পুরস্কার : ১৯৮৯ সালে ভারতীয় ভাষা পরিষদ দ্বারা তিনি 'ভুয়ালকা' পুরস্কার পান। ১৯৯০ সালের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত লেখার জন্য পান 'সাহিত্য একাডেমি' পুরস্কার।

অধ্যাপনা ছাড়া তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির প্রায় সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে সারা জলপাইগুড়ি জেলায় নেতৃত্ব দেন।

দেবেশ রায় : রাজনৈতিক জীবন

দাদা দিনেশ চন্দ্র রায়ের মাধ্যমে বাড়ির পরিবেশে রাজনীতির হাওয়া ঢুকেছিল লেখকের বাল্য বয়সে। সেই বাল্য বয়সেই তিনি কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। কমিউনিস্ট আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর সম বয়সী বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক সময়েই তাকে সরে থাকতে হত। তিনি লিখেছেন—'ছোট জলপাইগুড়ি শহরে ঐ বয়সে কম্যুনিষ্ট খ্যাতি অর্জন গৌরবের ছিল না বরং সমবয়সীদের ঠাট্টা তামাশার লক্ষ্য হতে হত।' তবে সামাজিক সাংস্কৃতিক পারিবারিক কারণে বড়দের প্রশ্রয় ও প্রশংসা পেতেন।

কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে মাত্র ১৪ বছর বয়সেই তিনি এ্যারেস্ট হন। এবং জলপাইগুড়ির রাজনীতির অঙ্গনে ঐ বয়সেই একটা জায়গা করে নেন। ১৯৫০-এ জলপাইগুড়ি মাদ্রাসার মাঠে কমিউনিস্ট পার্টির একটি জনসভা হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে পার্টি আইনী হওয়ার পর জলপাইগুড়িতে এটাই প্রথম জনসভা। মাঠের মাঝখানে একটি লাল ঝান্ডাপোতা, একটু দূরে অনিল মুখার্জী বসে আছেন। লোকজন নেই। হয়ত সাহস করে কেউ এগিয়ে আসতেও চান না। লেখক ঐ কিশোর বয়সে একা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যান ঐ লালঝান্ডা কিংবা অনিল মুখার্জীর দিকে। এমনি ছিল তাঁর আদর্শের প্রতি আনুগত্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিংশ কংগ্রেসে স্তালিন উদঘাটন, ৪৭'এ দেশভাগের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি, হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত সৈন্যের প্রবেশ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা কমিউনিস্ট পার্টিকে নানা প্রশ্নের সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু লেখকের উৎসাহ তাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। বরং আরও বেশি করে পার্টির কাজে মনযোগী হন।

'৬২ সালের অক্টোবরে চীন আসাম সীমান্তে এসে গেল। কমিউনিস্ট পার্টিকে অনেকটা বেকায়দায় ফেলল। "১৯৬২-র প্রথমে নির্বাচন, শেষে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ—রাজনীতি আমার ওপর সমুদ্রের ঢেউ এর মত শ্বাসরোধী ঝাঁপিয়ে পড়ল। অথচ তখন তো কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে দুর্বিপাকের কাল।" ৪

এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে গেল। সি পি আই ভেঙ্গে আর একটি পার্টির জন্ম হল সি পি আই (এম)। লেখক মূল পার্টি সিপিআই-তেই রয়ে গেলেন। এবং আরও বেশি করে পার্টিকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। পার্টির কাজে রাজবংশী জন সমাজে তিনি খুব বেশি করে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

"আমি খুব ছোটবেলা থেকে কমিউনিস্ট পার্টি করছি। কমিউনিস্টদের মধ্যেই বরাবর আছি, কখনো বাইরে থাকিনি। আমি প্রথম এ্যারেস্ট হয়েছিলাম ১৪ বছর বয়সে, ১৯৫০-এ, কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি হলে।" ৫

"কিন্তু '৬২-র চীন ভারত সীমান্তের ঘটনার ফলে পার্টি যখন ভাঙছে তখন ঘটনা চক্রে জলপাইগুড়িতে আমি প্রায় একক এবং সম্পূর্ণ একা। বাকি যারা সিপিআই-তে এসেছিলেন তারা কিছু পরে এসেছিলেন। প্রায় বছর দুয়েক প্রবল রাজনৈতিক, তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক একটি লড়াই গেছে। এটা আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।"৬ এরপর তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ১৯৬৫'র দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধা কী জিনিস কত ভয়ঙ্কর তা সরাসরি উপলব্ধি করেছেন মানুষের মধ্যে কাজ করবার ফলে। কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার ঝগড়াঝাটি গোলমাল ও ক্ষুধা এই দুটো জিনিস সে সময় তার অভিজ্ঞতাকে নতুন রূপ দিয়েছিল।

৬৫-র দুর্ভিক্ষ কাটতে না কাটতেই ৬৭'র নির্বাচন এসে গেল। এই নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলো। কিন্তু এরকম একটা অবস্থার জন্য কমিউনিস্ট বা বামপন্থীরা প্রস্তুত ছিল না। খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই এই জয় লাভ। 'জনগণ' ও 'ইতিহাস' যেন কথা বলে উঠল।

"আমরা সত্যি নিজেদের এই আরম্ভক্ষণের কর্মী বলে আবিষ্কার করেছিলাম।" ৭

নির্বাচনের আগে ও পরে তিনি রাজবংশী সমাজের সঙ্গে বেশি করে সম্পর্কিত হতে থাকেন। পার্টির কাজে রাজবংশীদের বাড়ীতে যাওয়া, থাকা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের অংশীদার হওয়া এক কথায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেতে থাকেন। তাতে রাজবংশী ভাষাটিও তাঁর আয়ত্বে চলে আসে।

"তখন আমি গ্রামে পড়ে থাকতাম এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে রাজবংশী ভাষা শিখে ফেললাম। ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করতে পারতাম।" ৮

১৯৬৭তেই প্রথম ভারতের অনেকগুলি রাজ্যে অনেকগুলি দলের সরকার ও কেন্দ্রে এক দলীয় সরকার দেখা গেল। '৬৭ থেকে '৭৭ এই পুরো দশকটাতেই এই অবস্থা চলতে থাকে। "আর '৬৭ থেকে '৭৭ কী এক আক্রমণের দশক, বামপন্থীদের আত্মহননের দশক, ভুল যুদ্ধে, ভুলপক্ষে আত্মবিসর্জনের দশক।" ৯

'৬৭-র সরকার কিছুদিনের মধ্যে ভেঙ্গে গেলে ১৯৬৯ এ প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে আবার যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। কিন্তু '৬৯-এর নির্বাচনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ও তার সহযোগী শক্তিগুলি ক্লিন্ন আত্মকলহে মেতে উঠল।' নকশাল বাড়িতে সৃষ্ট নক্শাল আন্দোলন সমাধান করতে পারল না যুক্তফ্রন্ট সরকার। '৬৭ থেকে ৬৯-র প্রতিরোধ আন্দোলন পাল্টেআক্রমণের আন্দোলনে রূপ নিল। 'সিপিআই (এম) ও নক্শালরা সম্মুখ যুদ্ধে আটকা পড়ে গেলেন।' এর সুযোগ নিলেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। "এক কলঙ্কজনক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করলেন কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। তার সেই ক্ষমতা দখলে

সহযোগিতা করল সিপিআই।" ১০ বিরোধীপক্ষহীন বিধানসভায় তিনি পাঁচ বছর রাজত্ব করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তত্ত্বে কাউন্টার-ইনসারজেন্সির তত্ত্ব আমদানি করলেন। গণহত্যা-অভিযান প্রশাসনের স্বীকৃতি পেল। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে দেবেশ রায় বলেছেন—

"রাষ্ট্র তার সমস্ত শস্ত্র দিয়ে আমাদের গলা টিপে ধরেছিল, শ্বাস নেওয়ার মত ফাঁক ছিল না। সমস্ত রকম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কে এক অবিশ্বাস আমার একেবারে ভিতরে সেঁদিয়ে গেল। সে অবিশ্বাস বোধ হয় আর কখনোই কাটবার নয়।"১১ জলপাইগুড়িতে তিনি যতদিন ছিলেন সারাক্ষণ পার্টির কাজই করতেন।

"৬২ থেকে ৭২ পর্যন্ত আমি জলপাইগুড়িতে প্রায় সারা সময় কমিউনিষ্ট পার্টি করেছি।"১২

বাল্যকাল থেকে যে বিশ্বাস, আদর্শবোধ দেবেশ রায়ের চেতনাকে পুষ্ট করেছে, যে পুষ্ট চেতনায় তিনি তাঁর লেখার জগৎকে পুষ্ট করেছেন, পেয়েছেন লেখক হিসেবে, রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে খ্যাতি এবং যে কমিউনিজমকে তিনি তাঁর নিজের ও সমাজের চালিকা শক্তি মনে করেন, আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সেই কমিউনিজমের এক বিধ্বস্ত রূপ কমিউনিস্ট দেশ গুলিতেই দেখা দেয়। লেখকের বিশ্বাসেও নাড়া দেয় সেই ঘটনা।

''আশির দশক শেষ হতে না হতেই প্রায় আণবিক বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ডতায় অথচ প্রায় বিস্ময়কর নীরবতায় বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক দ্রুত ধ্বংসের মধ্যে ঢুকে গেল। আর বছর তিনচারের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পরিচয় মানচিত্র থেকে মুছে গেল। আমার চেতনার কোন অস্পষ্ট শুরু থেকে সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন এক রাজনৈতিক কল্পনা হয়ে উঠেছিল। সে কল্পনা প্রতিদিন পুষ্ট হয়েছে এই ভারতীয় বাস্তবতার দৈনন্দিনে। সমাচোলচনা ছিল, আপত্তি ছিল, সংশয় ছিল তবু এসব কিছুর ওপর ছিল এক ধ্রুব বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের আর কোনো মাটি রইল না, রইল না কোন বিকল্প কল্পনা রচনার উপাদান।"১৩

রাজনীতিক দেবেশ রায় ও লেখক দেবেশ রায় একই সঙ্গে প্রায় ৭৫ সাল পর্যন্ত চলেছিলেন। তারপর রাজনীতিক দেবেশ রায়ের চেয়ে লেখক দেবেশ রায় অনেক বেশি দৃশ্যমান হয়ে উঠলেন।

এবার তার নির্ভরতা 'মানুষের সমাবেশের ওপর, সমবেত বিদ্রোহের ওপর, চৈতন্যে'র উন্মেষের ওপর, মানব সত্তার জাগরণের ওপর' — এই তাঁর অবলম্বন। তাঁর কথায় —"সেই অবলম্বন টুকু নিয়েই লিখব, বাঁচব। এটাও কেবল আশাই, যে আশা ছাড়া জীবন ধারণ করা যায় না, যতটুকু জীবৎকালই অবশিষ্ট থাকুক

না কেন এই আশাটুকু ছাড়া সেটুকুও পাড়ি দেয়া যাবে না।"১৪

দেবেশ রায় ঃ সাংবাদিক জীবন

১৯৪২-৪৩ সাল থেকে দেবেশ রায়ের জলপাইগুড়িতে স্থায়ী ভাবে বসবাস। ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ এম. এ. পড়ার জন্য কিছু দিন কলকাতায় ছিলেন। ১৯৫৮ তে এম. এ. পরীক্ষার পর আবার জলপাইগুড়ি ফিরে যান। ১৯৭৫ সালে একেবারে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে আসেন চাকুরির সুবাদে। সেই থেকে অদ্যাবধি তিনি কলকাতাতেই আছেন।

কলকাতায় এসে যাঁর সাহাচর্য তিনি সবচেয়ে বেশি করে পেলেন তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে। এছাড়া 'কালান্তরে'র রবিবারের পাতা ও শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের দায়িত্ব তারই হাতে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেশ রায়কে এই দুই কাজে জড়িয়ে ফেললেন। "আমি কলকাতায় আসার পর দীপেন আমাকে কোন প্রস্তুতির অবকাশও দেয়নি। তার কাজেকর্মে একেবারে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে নিল।"১৫

দীপেন্দ্রনাথের ইচ্ছাতেই দেবেশ রায় 'প্রগতি লেখক সংঘে'র সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং পরে এর অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি সমিতি' তৈরি হয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পী সাহিত্যিকরা একটা বড় আশ্রয় পেয়েছিল। দেবেশ রায় সেই সময় কিছু দিনের জন্য কলকাতায় ছিলেন। এবং বাংলাদেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে।

'পরিচয়'কে কেন্দ্র করে যে সারস্বত মণ্ডল তৈরি হয়েছিল দেবেশ রায় তার মধ্যে একজন হয়ে উঠলেন। বাংলা সাহিত্যের একটি ধারা 'পরিচয়'কে কেন্দ্র করেই রক্ষিত হয়েছিল। "পরিচয় এরকম সচল থাকায় কলকাতায় আসার পর আমি জলের মাছ জলে ভিড়ে গেলাম। 'পরিচয়' এর সেই আড্ডা প্রতি সন্ধ্যাতেই বসত আর শেষ হত প্রায় মধ্যরাতে।"১৬

১৯৭৯-র ১৪ জানুয়ারি আকস্মিক ভাবে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যু তাকে সম্পূর্ণ ভাবে একা করে ফেলল। দীপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বছর আগে দেবেশ রায় তাঁর দাদা দিনেশ চন্দ্র রায়কে হারিয়েছেন। লেখকের দুই বড় অবলম্বন এভাবে চলে যাওয়ায় তিনি প্রায় ভেঙে পড়লেন।

" পর পর দু'বছরে দাদা আর দীপেনের মৃত্যুতে আমার লেখালেখির কাজটা ফাঁকা আর অর্থহীন হয়ে গেল হঠাৎ কেমন বন্ধুশূণ্য ও সমর্থন শূণ্য হয়ে গেল। যেন আমার কারো কাছে কোন দায় রইল না। আমাকে নিয়েও কারো কোন দায় থাকল না। ১৯৭৯-র পর আমার লেখালেখি বন্ধও হয়ে যেতে পারত।"১৭

বন্ধ না হওয়ার অন্যতম কারণ 'পরিচয়'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়া। তরুণ লেখকদের নিয়ে নতুন করে লেখার জগতে প্রবেশ। এই সময়ে তাকে যিনি বেশি সহচার্য দিয়েছেন তিনি হলেন লেখক-সমালোচক অরুণ সেন। ১৯৮৩-তে 'প্রতিক্ষণ' নামে একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। পরে পত্রিকাটি মাসিক হয়। "প্রতিক্ষণে'র শুরু থেকেই দেবেশ রায় এর সঙ্গে যুক্ত হন। যদিও স্বপ্নাদেব-এর সম্পাদনা করতেন এবং প্রিয়ব্রতদেব ছিলেন প্রকাশনার দায়িত্বে। তবু যৌথ সম্পাদনার দায় ভার অনেক খানি বহন করতেন দেবেশ রায়। প্রথম দিকে এর সাংবাদিকতা সংক্রান্ত সব কাজ দেখাশুনা করতেন লেখক নিজে। প্রতিক্ষণ ছিল ' বাংলা ভাষায় সর্বভারতীয় পত্রিকা'। সেই সর্বভারতীয়তা রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সংবাদ সংগ্রহের জন্য দেবেশ রায়কে যেতে হত।

১৯৮৪ সালে 'প্রতিক্ষণ' থেকে একটি ইংরেজি পাক্ষিক পত্র ' পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' প্রকাশিত হয়। এই কাগজটি সম্পাদনার দায়িত্ব পান দেবেশ রায়। এর কাজের ভার এতখানি যে তাঁকে দু'বছর তাঁর কর্মস্থল থেকে ছুটি নিতে হয়। 'প্রতিক্ষণ' এর সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজনে ও 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্টের' সংগঠন তৈরির দরকারে তাঁকে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ঘুড়ে বেড়াতে হয়। সেই সুবাদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তব ছবি তিনি দেখেছেন এবং রাজনৈতিক নেতাদের ধরন ধারণ লক্ষ করেছেন— যা পরবর্তী কালে তার অনেক লেখাকে প্রভাবিত করেছে।

সাংবাদিকতার সঙ্গে দেবেশ রায়ের আবাল্য সম্পর্ক। ছোটবেলায় জলপাইগুড়ির স্থানীয় কাগজ 'জনমত', 'ত্রিস্রোতা'তে তিনি সাংবাদিক লেখাই লিখতেন। জলপাইগুড়িতে চাকরি করার সময় , কমিউনিস্ট পার্টির কাজের সময়, পার্টির পত্রিকায় খবর সরবরাহের কাজে তিনি সাংবাদিকতাই করেছেন। কলকাতায় এসে 'কালান্তরে' সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর 'প্রতিক্ষণ'। 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' এবং আরও অনেক পরে দৈনিক 'আজকাল'এ তিনি নিয়মিত সাংবাদিক রচনা লিখে গেছেন এবং মাঝে মাঝে এখনও লিখছেন।

গল্প উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রেও সাংবাদিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন— " সাংবাদিকতার

কাজ তথ্য নিয়ে, গল্প উপন্যাসের কাজও তথ্য নিয়ে। সাংবাদিকতা তথ্যের সেই ভিত্তিটা তৈরী করে দিতে পারে, যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে গল্প উপন্যাসে তথ্যের একটা মানব দলিল নির্মাণ করা যায়। .....সাংবাদিকতা ভাষাকে নষ্ট করে না, ভাষাকে পুষ্ট করে। তথ্যনির্ভরতায় আর তথ্য বর্ণনায় ব্যবহৃত হতে হতে ভাষার একটা শক্ত ভিত তৈরী হয়ে যায়। .....কিন্তু যে সাংবাদিকতা চলমান ইতিহাসের আধার, তার কাছ থেকে আখ্যান সাহিত্যের গ্রহন করার আছে অনেক। .....কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সাহিত্য আর সাংবাদিকতার মাঝখানের সীমারেখাটি অনেক সময়ই আমি অস্পষ্ট করে তুলি যাতে আমার আখ্যান সাংবাদিক হয়ে ওঠে, যাতে সেই আখ্যানের ভিতর সঞ্চারিত হয়ে যায় সাংবাদিকতার তৎপরতা, যাতে আমার ব্যবহৃত শব্দগুলি এক একটা তথ্যে ভরাট হয়ে উঠতে পারে।"১৮

দেবেশ রায় : গল্পকার

'গল্পসমগ্র' ছাড়া দেবেশ রায়ের লেখা গল্প সংকলন চারটি 'দেবেশ রায়ের গল্প (১৯৬৯), 'দুইদশক' (১৯৮২) , 'দেবেশ রায়ের ছোট গল্প (১৯৮৮), স্মৃতিহীন বিস্মৃতি হীন (১৯৯১)। এই চারটি বইয়ের ২৪টি গল্পই মূলতঃ পাঠকের চোখের সামনে ছিল। এই চব্বিশটির বাইরে যে বিশাল গল্পের জগৎ অগোচরে ছিল — তা নিয়েই তৈরি হল 'দেবেশ রায়ের গল্প সমগ্র' ৬টি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত লেখা গল্প গুলি। এসম্পর্কে লেখক বলেছেন — "প্রথম খণ্ডে রাখতে চেয়েছি সেই সময়ের লেখা গুলো যখন গল্প ছাড়া অন্য কোন চেহারায় আমি লেখালেখির কথা ভাবতে পারতাম না।"১৯ এই সময়ের গল্প গুলিতে আছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বাংলাগল্পের নামকরণ, সংলাপ-এর বদলানো রূপ এই গল্প গুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আরও একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে এই গল্প গুলির বিষয় রাজনীতি নয়। আবাল্য রাজনীতির মধ্যে বেড়ে ওঠা লেখকের পক্ষে রাজনীতিমুক্ত গল্প রচনা বিস্ময়ের বৈকি।

১৯৬১-র পর থেকে দেবেশ রায় গল্প লেখার পাশাপাশি উপন্যাস রচনাও শুরু করেন।

'গল্প সমগ্র' প্রথম খণ্ডের গল্প গুলি হলো - হাড়কাটা, নাগিনীর উপমেয়, আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা, অপরাহ্নের কান্না, সাত হাটের হাটুরে, দুপুর, শামুক, বত্রিশ আঙ্গুলে, জলধর ব্যানার্জীর মৃত্যু, স্মৃতিজীবি, পা, কলকাতা ও গোপাল, কালরাতের বেলায়, অসুখ, পশ্চাতভূমি, বেড়ালটির জন্য প্রার্থনা, ইচ্ছামতী, পায়ে পায়ে, অপেক্ষায়, দুঃসাময়িক, দাহনবেলা।

১৯৬২ থেকে ৬৭-র মধ্যে লেখা গল্প গুলি নিয়ে রচিত হয়েছে 'গল্প সমগ্র'র দ্বিতীয় খণ্ড। এই সময় গল্পের

পাশাপাশি দেবেশ রায় উপন্যাস রচনাও শুরু করেদিয়েছেন। এ সময়ের গল্প গুলো সম্পর্কে লেখকের নিজের উক্তি —"আজ যখন এই ৬২ থেকে ৬৭ সালের ভিতর লেখা গল্প গুলি পড়ছি, এই বইয়ের জন্যে সেই গল্পগুলির প্রুফ বার বার পড়েছি, যেমন পরতে হত গল্প গুলি লেখার সময়, তখন নিজেরই চোখে পড়ে যায় — এই সময় দলীয় রাজনীতির বাধ্যতায়, সংসদীয় রাজনীতির নিয়মে সাংগঠনিক রাজনীতির অনিবার্যতায় যতই আমাকে দৈনন্দিন কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদে ঢুকতে হয়েছিল। আমার গল্প গুলোর বাক্য ততই হয়ে উঠতে চেয়েছিল জটিলতর, প্রত্যক্ষ ঘটনা ততই অন্বিত হয়ে যাচ্ছিল পরোক্ষের সঙ্গে।"২০

৬২-র চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ, এরপর কমিউনিষ্ট পার্টি ভেঙে যাওয়া, ঘনিষ্ট বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাঁচির মানসিক হাসপাতালে স্থানান্তর ইত্যাদি ঘটনা স্রোতের মধ্যেই তাঁর এই পর্বের গল্প গুলির সংরচনা। তবে তাঁর নিজের কথায় — "এই খণ্ডের কিছু গল্পে তার শুরু টুকু মাত্র দেখতে পাচ্ছি। এখন যখন এতটা সময়কে একসঙ্গে মাপা যাচ্ছে, তখন মনে হয় ৬২-র পর থেকে আমার গল্প আর বিশেষ ঘটনা থেকে রাজনৈতিক কল্পনার সর্বজনীনে সমাধান পাচ্ছিল না।"২১

'গল্প সমগ্র' দ্বিতীয় খণ্ডের গল্প গুলি হল — ক্ষয় ও তার প্রতিকার, নিরস্ত্রীকরন কেন, উদ্বাস্তু, মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট, দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার, মর্তের পা, বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলকাতা, অমলেন্দুর, মালতীর ও আরো কয়েক প্রকারের ভালোবাসা, যুযুৎসু, দখল, সাধারণ চক্কোত্তির জীবন সূত্র, তিন পুরুষের উপ্যাখ্যান, অপভাবনা, রঞ্চুর রক্ত, ক্ষুধায় জন্মমৃত্যু, একটি দলিল চিত্র, সতীমিলিদের নিয়ে, জননী। জন্মভূমি!!, মিলন পিয়াসী, ধর্না, অনাসক্ত, বানা। কিন্তু এই সময়ের লিখিত একটি তালিকা দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টতে দেওয়া হয়েছে। তাতে গল্পের সংখ্যা ২৯টি। আর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ২৩টি। ৬টি গল্প দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পায়নি। সেই গল্প গুলি হল — বাজি, ক্রীতদাস, ইতিহাসের রবিবারের সকাল, রথের মেলায় নিরুদ্দেশ, সনাক্তকরণ ও মাগো বন্দেমাতরম বলে।

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ সালে লেখা গল্পগুলিকে নিয়ে দেবেশ রায়-এর গল্পসমগ্র'র তৃতীয় খণ্ড। এই সময়কালটা পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯৬৭তে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট বা অ-কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় এলো। যেখানে বামপন্থীদের না ছিল কৃতিত্ব, না ছিল প্রত্যাশা। সে জন্য সরকার মজবুত হয়নি। অল্প সময়ে ভেঙে যায়। পুনরায় ১৯৬৯-এ ক্ষমতালাভ। কিন্তু এবারেও বামপন্থীদের ভিতর আত্মকলহ শুরু ৭৭ পর্যন্ত — নতুন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত। ৬৭ থেকে ৭৭ এই দশ বছর দেবেশ

রায়কে পেরুতে হয়েছে প্রচুর দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ব্যর্থতা ও সাফল্যের মধ্যে দিয়ে। সে জন্য এসময়ে রচিত গল্পের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। 'গল্প সমগ্র' তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন — " গল্প গুলো এই ধারাবাহিকতাতে লেখা হলেও, এখন দেখা যাবে মাঝে মধ্যে ফাঁক থেকে গেছে। যেন ৬৮ সালে আমি ঐ একটা মাত্রই গল্প লিখেছিলাম, বা ৬৯-৭০ সালে, ৭২ সালে বা ৭৫ সালে কিছুই লিখিনি।"২২

তাহলে এ সময়ে কী তিনি অন্য কিছুই লেখেননি? তাঁর নিজের উক্তি— "এই দশটা বছর কেটেছে আমার একটার পর একটা উপন্যাস লেখায়— 'মানুষ খুন করে কেন', 'যযাতি', 'বেঁচে বততে থাকা', 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে', ' মফঃস্বলি বৃত্তান্ত'"।২৩ " আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' ও 'মফঃস্বলি বৃত্তান্ত'র মাঝখানে লেখা হয়েছিল 'সাপের সঙ্গে সহবাস', কয়েদখানা', 'অনৈতিহাসিক' প্রভৃতি গল্প।"২৪

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত লেখা গল্পের তালিকা নিম্নরূপ— রাষ্ট্রপতি শাসনে, জয়যাত্রায় যাও হে, ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে, রাখি পূর্ণিমার রাত, মানুষরতন, সাপের সঙ্গে সহবাস, কয়েদখানা, অনৈতিহাসিক, আগডুম-বাগডুম-ঘোড়াডুম, জরিপ, রক্তের অসুখ, মূর্তির মানুষ। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫ এই ৭/৮ বছরে তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা মাত্র ১০। ১৯৭৫ সালে কলকাতায় আসার পর তিনি খুব বেশি করে জড়িয়ে পড়েছিলেন সাংবাদিকতায়। লেখকবন্ধু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে তিনি যুক্ত হন 'পরিচয়' এর সঙ্গে। পরে সম্পাদকও হন। নিয়মিত 'কালান্তরে' লিখতে থাকেন। বারোমাস, প্রতিক্ষণ, পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট পত্র পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করেন, অন্য দিকে একটার পর একটা উপন্যাস লিখতে থাকেন। ফলে তাঁর ছোট গল্পের সংখ্যা কমে যায়। এই সময়ের লেখা ছোট গল্প গুলি হলো— উচ্ছেদের পর, জোতজমি, সাইক্লোনের চোখ, যৌবন বেলা, শরীরের রকম ফের, মানচিত্রের বাইরে, অন্ত্যেষ্টির রীতিবিধি, আইনানুগ ও প্রমোদকরহীন, মুখের সত্যমিথ্যা, জন্মপ্রজন্ম। এই গল্পগুলি নিয়ে রচিত হয়েছে 'দেবেশ রায় গল্প সমগ্র' চতুর্থ খন্ড।

'গল্পসমগ্র' পঞ্চমখণ্ডের ভূমিকায় দেবেশ রায় লিখেছেন —"১৯৮৭ থেকে ৯৪ সালের মধ্যে লেখা যোলটি গল্প নিয়ে 'গল্প সমগ্র' এর এই পঞ্চম খণ্ডে আমার শেষতম গল্পটিও জায়গা পেয়ে গেল। আপাতত তাই এটাই 'গল্প সমগ্র' এর শেষ খণ্ড যতদিন না আর একটি খণ্ড হওয়ার মত গল্প জমে ওঠে। এই খণ্ডটি তৈরী করতেই করতেই গল্প লেখা করুণ ভাবে কমে আসছে। ৯০ সালে বা ৯১ সালে অনেক দিন পর চারটি বা তিনটি গল্প লিখে ফেলেছিলাম বটে কিন্তু ৯১ থেকে ৯৪ এ কোনো গল্পই লিখিনি। ৯৪-এও মাত্র একটি।"২৫

223079

31 MAR 2010

NBU, DARJEELING ★ LIBRARY ★

এই গল্প কমে যাওয়ার নানা কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে লেখক কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন এভাবে — "যেমন আমার অভ্যাস, হয়তো কোন উপন্যাসের টুকরো , ছোট গল্প হিসাবে পেয়েছি, পরে সে লেখা উপন্যাসেই যথাস্থানে ফিরে গেছে।' .....দুই) ' নিজের কাছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ছোট গল্পের ভাবনা আর অমন চট করে মাথায় খেলে না, সে অনেকদিন হলো।' তিন) ' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির যেমন একটা অদল বদল ঘটে যায়, এ অনেকটা তেমনই। তবু এ হয়তো আমারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এমন উদাহরণও প্রচুর পাওয়া যাবে যাতে আমার এই অভিজ্ঞতার বিপরীতটাই প্রমাণিত হবে। সে প্রমাণ সত্ত্বেও তো একথা সত্য যে আমি আর বেশি ছোট আখ্যান লিখতে পারছি না, না লিখতে পেরেও আমার বছরের পর বছর কেটে যেতে পারে— তাতে হয়তো কখনও কখনও খারাপও লাগে। কিন্তু তার ফলে অবস্থা তো বদলায় না।"২৬

এই পঞ্চম খণ্ডে প্রাকাশিত গল্প গুলি হল — স্মৃতিহীন বিস্মৃতিহীন, স্বদেশ বিদেশ, মুখের দরদাম, বৃষ্টিবদল; স্বপ্নজাগরণের ব্রত, এই উপকথার দুই আরম্ভ, জীবনানন্দের মুখ, ছেলেরা করে খেলা, আমিষ নিরামিষ, আত্মসচেতনতার ফাঁক ফোঁকর, অসংরক্ষণ, ভয়, গীতাল যুগীনের টেকনোলজি গ্রহণ, নদীরাম জঙ্গলরাম, বৃষ্টি কলরোল, গ্লোবালাইজেশন।

—ঃ ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ এর মধ্যে প্রকাশিত গল্পের তালিকা ঃ—

১) বাণিজ্য যাত্রারই এক ধরন	বারোমাস শারদীয়-১৯৯৫
২) স্বর্ণ দুর্গার উপাখ্যান	কালান্তর শারদীয়- ১৯৯৫
৩) বাবা গীতালের শেষ যাত্রা	কালান্তর শারদীয়- ১৯৯৬
৪) গান্ধারীর চোখ	বারোমাস শারদীয়- ১৯৯৭
৫) তিস্তাপুরাণ	পরিচয় শারদীয়- ১৯৯৭
৬) শব্দ তত্ত্ব নিয়ে	কালান্তর শারদীয়- ১৯৯৭
৭) বাঁচা না বাঁচার নিশানা	দেশ শারদীয়- ১৯৯৭
৮) উড়িয়াল	প্রমা শারদীয়- ১৯৯৮
৯) খা	কালান্তর শারদীয়- ১৯৯৮

উপরোক্ত গল্প গুলি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'গল্প সমগ্র' ষষ্ঠ খণ্ড। 'গল্প সমগ্র' ৫ম খণ্ডের ভূমিকায় দেবেশ

রায় বলেছেন - ' এখন 'গল্প সমগ্র' এর এই আপাত শেষ খণ্ডের ভূমিকা লিখতে লিখতে শুধু আশা করতে পারি ভবিষ্যতে আরও একটি খণ্ড তৈরী করে তোলার মত গল্প ধীরে ধীরে জমে উঠবে।'

লেখকের সেই 'আশা' সেই ধীরে ধীরে জমে ওঠা গল্প গুলি নিয়েই ষষ্ঠ খণ্ড রচিত হয়েছে। লেখকের কাছে পাঠক আশা করে পরবর্তী আরও এক বা একাধিক 'গল্প সমগ্র' খন্ডের।

ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় ও তার রচিত উপন্যাসের ধারায় ' তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'

দেবেশ রায় গল্পকার, প্রবন্ধকার, সম্পাদক, সাংবাদিক , কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে তার পরিচয় অধিতর ব্যাপক। তার রচনা ধারায় ' তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' একটি বিস্ফোরণ। তিস্তা কেন্দ্রিক আর একটি বিস্ফোরণ হল ' তিস্তা পুরাণ'— বাংলা উপন্যাসের ধারায় যা অনন্য, অভিনব ও আধুনিকতম।

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে দেবেশ রায়ের আবির্ভাব গল্পকার হিসাবে। ১৯৫৫ সালে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র দেবেশ রায় 'দেশ' পত্রিকায় 'হাড়কাটা' নামে একটি গল্প লিখে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা করেন। তবে লেখালেখির কাজ তাঁর কিশোর বয়স থেকেই স্কুল, কলেজের পত্র-পত্রিকায়। তাঁর নিজের কথায় - ' কবে যে লিখিনি আর কবে যে সে লেখা কোন না কোন চেহারায় ছাপা হয়নি— তা, আর এখন মনেও পড়ে না।"২৭

১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত লেখা গল্পগুলি নিয়ে প্রকাশিত হল তাঁর গল্প সমগ্রের প্রথম খণ্ড। এই পাঁচ-ছ'বছর ধরে তিনি কেবল গল্পই লিখেছেন। অন্য কোন মাধ্যমে লেখার কথা ভাবেন-ই নি। উপন্যাস লেখার কথা তাঁর মনেও আসেনি। ' এই লেখাগুলি যখন লিখেছি তখন উপন্যাসের 'গল্পের ওপর এই বিকল্পহীন নির্ভরতার সময়ে বাংলা ছোটগল্পে আধুনিকতার একটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 'দেবেশ রায়ের গল্প গুলিতেও সেই প্রবাহ এসে লাগে— গল্পের নামকরণে, সংলাপে, ডিটেললসের চর্চায় । তাঁর রচনাতেও দেখা যায় ' বানানের কত কৌশল, যতি চিহ্নের কত ব্যবহার, বাক্য গঠনে কত ভাঙ্গন।'

এতে অবশ্য তিনি ততটা খুশি হতে পারেননি — তাঁর মনে হয়েছে 'বাস্তব যে অভিজ্ঞতা বাস্তবকেই প্রধান করে তুলতে পারে তার অভাব' রয়েছে সেখানে। সুতরাং অনুসন্ধান চলতে থাকে অন্য কিছুর।

১৯৬১ -র পর তিনি শুধু গল্পই নয় উপন্যাস লেখাতেও হাত দেন। ১৯৬১ -র পর পরপর কিছু ঘটনা — তাঁর চিন্তার জগতে আলোড়ন আনে। ১৯৫৭-তে কেরলে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির সরকার গঠন, তাঁর ঘনিষ্ট

কমিউনিস্ট বন্ধু দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।, ১৯৫৮-য় হাঙ্গেরিতে সেভিয়েত সৈন্যের প্রবেশ, স্তালিন উদঘাটন, ৬২-র অক্টোবরে চীন-ভারত যুদ্ধ, কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। নিজে একজন কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হওয়ায় এই ঘটনা গুলি তাকে বেশি করে স্পর্শ করেছে। এহেন সর্বনাশ তাঁর কর্ম ও চিন্তাকে, তাঁর লেখকসত্ত্বাকে ভিন্নরূপ দিয়েছে।

"কিন্তু এই সর্বনাশের মধ্যেই জলপাইগুড়ির গ্রাম, তার রাজবংশী মানুষজন, সেই মানুষজনে বিধৃত প্রকৃতি, রাজবংশী বাচন, তিস্তা নদী, চা বাগানের শ্রমিক, ডুয়ার্স, ফরেস্টের লোকজন, ফরেস্টের গাছপালা— জঙ্গল-পশু-পাখির এক ভুবনে আমার অধিকার কায়েম হতে শুরু করল, দিনের পর দিন ধরে, বছরের পর বছর ধরে।"২৮

এই অভিজ্ঞতা ও নব আধুনিকতার অন্বেষণ তাকে গল্পের জগৎ থেকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল উপন্যাসের জগতে। সেই সময় তাঁর আত্ম আবিষ্কার— 'গল্প লিখতে শুরু করে উপন্যাস হয়ে যায়', 'ছোট গল্পের ওপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলি, 'লিখলেই বড় হতে চায়' ইত্যাদি। ফলে লেখা হতে থাকে একের পর উপন্যাস — 'যযাতি', 'মানুষ খুন করে কেন', 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' ইত্যাদি।

চরিত্রের ব্যাপকতার অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতার বড় পটকে ধরার লক্ষেই তাঁর গল্প থেকে উপন্যাসে আসা। লেখক জীবনের প্রথম প্রায় দশ বছর যিনি উপন্যাস লেখেনই-নি, যখন গল্প ছাড়া অন্য রকমের কথা ভাবতেই পারেননি, পরবর্তী সময়ে তাকেই বলতে শোনা যায় গল্প লেখায় তাঁর আর এখন মন নেই, কিংবা 'লিখতে বসে ছোট বা বড় এসব তাঁর কাছে জরুরী নয়।' এ ধরণের কথা তিনিই বলতে পারেন উপন্যাসের রক্তমাংস যার সর্বাঙ্গে।

১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫-র ভেতর তিনি 'মানুষ খুন করে কেন' উপন্যাসটির প্রথম খসড়া প্রস্তুত করে উপন্যাস কাকে বলে তা বুঝতে চেয়েছিলেন। এই উপন্যাসটি লিখতে বসে সময় লেগেছিল মোট ১৩ বছর — ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৬। এরই মধ্যে 'যযাতি' লিখিত হয় ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে, বই রূপে প্রকাশ ১৯৭৩-এ। সেদিক থেকে 'যযাতি'ই দেবেশ রায়ের প্রথম উপন্যাস। ১৯৬৮ তে আর একটি উপন্যাস ' বেঁচে বততে থাকা' রচিত হয়- যা নিজের বেগেই উপন্যাস হয়ে উঠল।

'যযাতি'তে গিরিজামোহন -রেনু ও খোকার বিচ্ছিন্নতা সময়ের অন্যমাত্রা স্পর্শ করতে চায়। তাদের সম্পর্কে জটিলতা আসলে দেশ ও কালেরই জটিলতা। বাবা-মা ও ছেলের বিবরণের মধ্যে তাদের ব্যক্তিগতের মধ্যে

ছায়া ফেলে বাইরের ইতিহাস। গিরিজামোহনকে ও উত্তরাধীকারকে অস্বীকার করে খোকা নতুন করে জন্মাতে চায়—সে জন্য সব ত্যাগ করে চলে যায়। এখানে চরিত্রের নিজস্ব বিররণ এমন যুক্তিতে লেখা হয় যা বিবরণকে স্বাবলম্বন দিয়েছে। বিষয়ই কর্মকে নতুন আধুনিকতার আস্বাদ দিয়েছে।

'মানুষ খুন করে কেন' তে ক্ষেত্র আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। এই উপন্যাসের নায়ক আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির এক বিকার। কিন্তু এই নেতির বিপরীতে তার কর্মময়তা আভাসিত হয় কোনো এক সময়ে। এখানে লেখকের অভীপ্সা ও ক্ষমতা চিনে নিতে কারও কোনো অসুবিধা হয় না।

'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে'তে দেখা যায় চরিত্র ও পরিবেশকে ডিটেলসে বিস্তারিত হতে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহুস্তরে বিন্যস্ত বাকভঙ্গির জটিলতা। উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' কে একটা 'ব্রেক'ও বলা যেতে পারে।

''ক্রমশ প্রতিবেদনে ও বৃত্তান্তে এই দুই বিপরীত প্রতিক্রিয়ায়, গঠনে যে দেবেশ রায় ব্যক্তি ও ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়াকে ধরেন, তাঁর সূত্রপাত এই উপন্যাসে। ' যযাতি', মানুষ খুন করে কেন'র পর্যায় শেষ হয়ে যায় এই উপন্যাসের বয়ানে, ডিসকোর্সে।''২৯

এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম ছকের বাইরে এলেন। ' আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে', লিখতে গিয়ে তিনি জানালেন যে আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার আখ্যানকে কিভাবে বদলাতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে তিনি উত্তরবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করার সুবাদে রাজবংশী ভাষা সুচারু রূপে আয়ত্ব করেছেন। এই ভাষার সার্থক প্রয়োগ দেখা গেল পরবর্তী 'মফস্বলি' বৃত্তান্তে।

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে তিনি লিখেছেন মাত্র কয়েকটি গল্প। কারণ তখন তাঁর লেখা যেন গল্পের আধারে আর আটছিল না। এই সময় প্রায় দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এসেছিল বহু পরিবর্তন। ১৯৬৭ ও ৬৯ এ দু'বার পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় আসে— কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। সারা বাংলায় সে কি উন্মাদনা, সে কি জাগরণ। কিন্তু সে সময় বামপন্থী শিবিরে মতানৈক্য দেখা দেয় প্রচুর। সৃষ্টি হয় নকশাল আন্দোলন। ১৯৭২ সালে আবার ক্ষমতায় আসে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার। নকশাল আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন থেকে যুব আন্দোলনের রূপ নেয়। শুরু হয় নকশাল দমনের নামে গণহত্যার যুগ।

'৭৭ সালে, এত রক্তক্ষয় ও আত্মবিনাসের পর আবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হল যা

এই সন্দর্ভ লেখার কাল (২০০৮) পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কার, উন্নয়ন, অপারেশনবর্গা ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বহু নব নব দিকের উন্মোচন করে। দলীয় রাজনীতির অবক্ষয়, দলাদলি, সংকীর্ণতা ইত্যাদি উল্লেখ করার মতো। দেবেশ রায়ের লেখক সত্তায় ইতিবাচক, নেচিবাচক সবই ধরা পড়েছে। মফস্বলি বৃত্তান্ত লেখা হয় ১৯৭৪ সালের জুন মাসে। এই উপন্যাসখানি লেখা হয় একবারেই, কিন্তু পাঁচ-ছ'বছর ধরে এর বিভিন্ন অংশ পত্রপত্রিকায় বের হয় কখনো উপন্যাস হিসাবে, কখনও বড় বা ছোট গল্প হিসাবে। এতে তিনি উপন্যাসের সমগ্রতার একটা চেহারা দেখতে পান। তিনি অনুভব করেন " আখ্যানকে একটি ছোটগল্প বা একটি বড় উপন্যাসের ভিতর সম্পূর্ণ আটাতে গেলে আখ্যানের সর্বাতিশায়িত খর্ব হয়। আখ্যানকে যদি সেই নিগড় থেকে মুক্ত করে দেখা যায় তাহলে তা কখনো ছোটগল্পে, কখনো বিবরণে, কখনো উপন্যাসে, কখনো কাহিনিতে ছড়িয়ে যেতে পারে, আবার এই ছড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ভিতর যে ঐক্য থাকে সেটাই সেই আখ্যানের শিল্পগত ঐক্য।"৩০

এভাবে একটা গোটা লেখা লিখে তাকে টুকরো টুকরো করে কাগজে প্রকাশ করা, আবার তাকে একত্রে বই করে তোলার মধ্যে একটা ত্রিস্তর শিল্প পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়।

'মফস্বলি বৃত্তান্ত' উত্তরবঙ্গের কৃষক জীবনের একটি নিখুঁত দলিল। উপন্যাসটির সাতটি অধ্যায় জুড়ে খেত খেতু তার ভাইপো চ্যারকেটু, তার বউ টুলটুলি- তাদের বাচ্চা-কাচ্চা, আট বছরের বৈশাখু, ছ বছরের বেঙ্গু, চার বছরের খেতেশ্বরীদের শুধু ক্ষুধা জর জর জীবন। চরিত্র গুলির শরীরের বর্ণনায়, বাচনে, চিন্তনে, স্বপ্ন দেখায়, শুধু ক্ষুধারই কথা। আর এই কথার মধ্যে — সমাজের অনুপুঙ্খ ছবি কখনো ধানক্ষেতের বর্ণনায়, কখনো পার্টির মিছিলে, আইন অমান্য আন্দোলনে ও নেতাদের রাজনৈতিক ভাষণে।

আশির দশক শেষ হতে না হতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশ গুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে। লেখকের আবাল্য পুষ্ট সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন যা একটা রাজনৈতিক কল্পনা হয়ে উঠেছিল তা প্রবল বেগে ধাক্কা খায়।

"সে বিশ্বাসের আর কোন মাটি রইল না, রইল না কোনো বিকল্প কল্পনার রচনার উপাদান। .....ইতিহাসের এমন পশ্চাদ অপসারণ শতাব্দীতে ঘটে না, সহস্রাব্দেও ঘটে কী না সন্দেহ। আমরা সেই পশ্চাদ অপসারণের সঙ্গী হয়ে থাকলাম আর হলাম ভূমিকাহীন অংশীদার।"৩১

বিশ্বাস ও কল্পনা এভাবে ধসে যাওয়ায় লেখক লেখাকেই আঁকড়ে ধরলেন একমাত্র সঙ্গী হিসাবে। লেখা

হতে থাকল একটার পর একটা উপন্যাস — 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, (১৯৮০) জীবন রচিতে প্রবেশ (১৯৮৩), হনন আত্মহনন (১৯৮৪),সমুদ্রের লোকজন (১৯৮৬), আত্মীয় বৃত্তান্ত (১৯৮৮), সময় অসময়ের বৃত্তান্ত (১৯৯৩) , খরার প্রতিবেদন, দাঙ্গার প্রতিবেদন, শিল্পায়নের প্রতিবেদন— ইত্যাদি প্রতিবেদন, তিস্তা পুরাণ (২০০০) ও আরও বহু উপন্যাস।

'মফস্বলি' বৃত্তান্ত লেখার পর — মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পারিক সম্পর্ক ও মিলেমিশে যাওয়ার কাহিনি, উত্তরবঙ্গের মাঠ, নদী,জল, বন, ও তার অবিচ্ছিন্ন অংশ রাজবংশী সমাজ, তাদের ক্ষুধা, উন্নয়ন, প্রত্যাখ্যানের জন্য মফস্বলি বৃত্তান্তের চেয়েও বড় আধার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এ সময় দেবেশ রায় ১৯৭৫-এ কলকাতায় চলে আসেন উপচে পড়া অভিজ্ঞতার থলি নিয়ে। কলকাতার নাগরিক পরিবেশে, জলপাইগুড়ি, তিস্তা, ফরেস্ট, রাজবংশী সমাজ, চা বাগান ও তার শ্রমিকরা যেন লেখকের মানস পটে আরও বেশি করে দৃশ্যমান হয়ে উঠল। অভিজ্ঞতার এই প্রবল চাপেই তিনি লিখলেন ' তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'।

তিনি বুঝতে পারলেন, '"আমার ভিতরে একটা বিষয় যখন আধার খোঁজে তখন জলপাইগুড়ির মানুষজন ও প্রকৃতির মধ্যেই আমি সেটাকে সহজে খুঁজে পাই বা পেতে চাই।' 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র লেখাও শুরু হল সেই সহজ অধিকার বোধ থেকেই।"৩২

সময় অসময়ের বৃত্তান্ত ঃ

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' লিখতে লিখতেই আর একটি বৃত্তান্ত লেখা হতে থাকে ' সময় অসময়ের বৃত্তান্ত'। প্রত্যক্ষ ঘটনাকে অবলম্বন করে লিখিত হতে থাকে একের পর এক কাহিনি। নানা অখ্যান কাহিনির মধ্যে রচিত হতে থাকে। কাহিনি ঘটে যাওয়ার পর আর একটি কাহিনি তাতে যুক্ত হয়ে যায়। আগের কাহিনি বদল হয়। প্রত্যক্ষ ঘটনা যা লিখিত নথিপত্রের অন্তর্ভূক্ত তার সঙ্গে উপন্যাসও তার স্বতন্ত্রতা নিয়ে হাজির হয়।

শুধু অভিজ্ঞতা নয়, তথ্য নির্ভরতার সঙ্গে যুক্তি এবং মানবমুক্তির সুতীব্র বাসনা এ উপন্যাসের বিন্যাস তৈরির সহায়িকা শক্তি। কতগুলি ঘটনা প্রত্যক্ষত বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে। যেমন বিশ্বনাথ নামে এক নকশাল কর্মীর ঘরছাড়া, পুলিশের হাতে ধরা পড়া, জেল ভেঙে পালানো, অজ্ঞাত বাস, আবার ধরা পড়া। পুনাসি বাঁধ নির্মাণ, নির্মাণের সময়ে পাড়াড়িয়া গ্রামে জসিডি থানার পুলিশের দ্বারা ২৫ জন নারীকে ধর্ষণ করা, এর প্রতিবাদে মিটিং, মিছিল, মামলা, মোকদ্দমা, বিচার, বিচারে পুলিশের বেকসুর খালাস, নারীদের উপর অপবাদ, কলকাতার বেহালায় বিষ তেল খেয়ে বহু মানুষের অসুস্থ হওয়া, এর প্রতিবাদে মিছিল, ষ্টোনম্যান, ধড়পাকড়

ইত্যাদি নানা ঘটনা সরকারের অফিসে নথিভুক্ত ঘটনা। এই ঘটনা গুলিকে এক লাইনও বিকৃত বা পরিবর্তিত না করে লেখক তার মধ্যে উপন্যাসের যুক্তি মননশীলতা আরোপ করে — উপন্যাসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই উপন্যাসে বা বৃত্তান্তে আটটি কাহিনি আটটি পর্বে বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত।

(১) কামাক্ষী, গোপা, মেয়ে-মিতু, ছেলে মিঠুর কাহিনি। এদের নতুন ফ্লাট বাড়িতে মধ্যবিত্ত জীবন। ফ্লাটের অদূরে বস্তি উৎখাত, অফিসে যেতে বাসের হাঙ্গামা, অফিস, কম্পিউটার, বাড়ি, টিভি, খেলা দেখা ইত্যাদি দৈনন্দিন। নিরাপদ জীবনে ভাই বিশ্বনাথের খোঁজে পুলিশের জেরা - নানা ছোট বড় ঘটনা নিয়ে প্রথম অধ্যায় ' ডেভেলপমেন্টের সময় এরকম ঘটে থাকে, আগের নাম ছিল ' দিন যাপনের কৃৎ কৌশল।' এটি লিখিত হয় ১৯৮৩ তে।

(২) ' কনষ্ট্রাকশনের সময় এরকম ঘটে থাকে' - অধ্যায়ে কনষ্ট্রাকশন বলতে বিশেষ ভাবে পুনাসিবাঁধ নির্মাণকেই বোঝানো হয়েছে। এখানে গাওনা না হওয়া মেয়ে আনোপিকে নিয়ে নানা ঘটনা, স্বামী কর্তৃক আনোপী অপহরণ, আনোপীর মার বিলাপ, একলাল চৌকিদারের হস্তক্ষেপ, পাড়াড়িয়া গ্রামে একলাল ও অন্য এক পুলিশ কর্মীকে গ্রামবাসীদের মারধোর, বদলা নিতে জসিডি থানার পুলিশ বাহিনী কর্তৃক ২৫ জন গ্রামের রমনীর ওপর সারারাত নিষ্ঠুর ধর্ষণ। ১৯৮৯-এর ১৯ এপ্রিল বিশ্বনাথের জেলে ফিরে আসার আগে ও পাড়াড়িয়া মামলার রায় বেরবার আগে পাড়াড়িয়া ধর্ষণ নিয়ে ১৯৮৮ তে এই আখ্যান লেখেন লেখক।

(৩) 'বিচারের সময় আদালতে এরকম ঘটে থাকে' লিখিত হয় ১৯৯০ এ। এতে লিখিত হয় পাড়াড়িয়া ধর্ষণের মামলার রায়। রায়ে বিচারক অভিযুক্ত পুলিশদের বেকসুর খালাস করে দেন। বরং ধর্ষিতা মহিলাদেরই অসংযত যৌনাচারের অভিযোগ আরোপ করা হয়। সাংবাদিক কনক - এই রায়ের কপি জোগাড় করেন — তাতে পুলিশ, আদালত, উকিল, সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, ধর্ষণ সম্পর্কে বিস্তৃত কথা লেখা আছে।

(৪) ' ধর্ষণের পরের সকালে এরকম ঘটে থাকে, অলৌকিক খণ্ড' লিখিত হয় ১৯৯০ এ। এই অংশে কেলু রাধিয়ার আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এক সংসার বিবাগী যুবক কেলুর সঙ্গে বাপ-মা মরা রাধিয়ার বিয়ে। বিয়ের পরই কেলুর গৃহত্যাগ। ফিরে আসে সেদিন যেদিন রাধিয়া পুলিশ বাহিনীর দ্বারা ধর্ষিতা হয়। কেলু সেই নরক দর্শন করে।

(৫) ' ধর্ষণের পরের সকালে এরকম ঘটে থাকে, অলৌকিক খণ্ড' - লিখিত হয় ১৯৯১ এ। এতে ধর্ষণের পরের সকালে ধর্ষিতা নারীদের স্ব স্ব লজ্জা, যন্ত্রণা ও সামগ্রিক যন্ত্রণার কথা বর্ণিত হয়েছে। পাশোয়ান,

যোগীন্দরদের পরামর্শে এর প্রতিবাদ- অভিযান, নানা কর্মসূচি গ্রহণ, রাধিকার নেতৃত্বে দেওঘর যাত্রা।

(৬) ' স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের সময় এরকম ঘটে থাকে' নগরখণ্ড এ আছে কলকাতার সমকালীনতার ভয়াবহ দুঃখময় অভিজ্ঞতা গুলো। কেলুর হাসপাতালের অভিজ্ঞতা, ডাক্তারদের সঙ্গে কথাবার্তা, তেল কেসে রোগীদের সঙ্গে কেলুর মিথ্যারোগী সাজা, রোগীদের আন্দোলন, মন্ত্রীর ভূমিকা, সাংবাদিক সম্মেলন, আত্মহত্যার প্রস্তাব কেলুর সম্মতি, স্টোনম্যানের কাহিনি ইত্যাদি।

(৭) 'স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের সময় এরকম ঘটে থাকে' সাগর খণ্ড: এখানে আছে কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে কেলু এসে পড়ে গঙ্গার ধারে। সাগর যাত্রী সাধুদের দেখা হয়। একজন সাধুর চেলা বনে যায়। নাঙ্গা সাধু জামা কাপড় পরে—কলকাতা দর্শন করায়। পরে সাগরে চলে যায়। সাগরে পিণ্ডদান। আরও ভিতর সমুদ্রে গমন। ঢেউয়ে পা দিয়ে অবতার হয়ে যায়। এদিকে রাধিয়াও ধর্ষিতাদের নেতৃত্ব দিয়ে অবতার বনে যায়। কেলুর আখ্যান, রাধিয়ার আখ্যান, কলকাতার আখ্যান লেখক ৮৮ সাল থেকেই লিখে রাখছেন। "৮৮ তে লিখেছি, ৯০ এ লিখেছি, ৯১ এ লিখেছি। ৯২ এও লিখেছি।"৩৩

(৮) ' বিপ্লবের সময় এরকম ঘটে থাকে'। এখানে বিশ্বনাথের প্রত্যাবর্তনের কাহিনি আছে। অজ্ঞাত বাস সেরে কলকাতা ফেরা, মুক্তির আনন্দ, হাওড়ায় আবার ধরা পড়া। বিশ্বনাথকে নিয়ে বানানো গল্প। কানুর ধরা পড়া, পুলিশি অত্যাচার। ইত্যাদি।

এই বৃত্তান্ত'র 'গ্রন্থবন্ধন' অংশে ১. রচনার ইতিহাস ও কারণ ২. রচনার পদ্ধতি ৩. রচনা পাঠের সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থবন্ধনের সূত্র ধরে বলা যেতে পারে বৃত্তান্ত বর্ণিত কাহিনিগুলি কাগজে, আদালতে পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত। লেখকের নিজের কথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে " আমি শুধু পাঠককে জানিয়ে রাখতে চাই এই বৃত্তান্তের সব কাহিনি-ই এই বৃত্তান্ত লিখিত হওয়ার আগে নথিভুক্ত। এই বৃত্তান্ত না লেখা হলেও এই কাহিনিগুলি কাহিনি হিশেবে আছে। আমি শুধু নথির ভিতর উপন্যাসের সংক্রমণ ঘটিয়েছি।"৩৪

উপন্যাসের এই সংক্রমণ ঘটনানোয় যে উপন্যাস সত্য রচিত হয়েছে— তাতে সরকার, পুলিশ, আইন, আদালতের নথিভুক্ত সত্যের অন্তঃসার শূন্যতা উদঘাটিত হয়েছে। লেখক মনে করেছেন " তারাই এই নথিপত্রের একমাত্র সংরক্ষক আর তাদেরই সংরক্ষণেই নথিপত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য এই কল্পকথার বিপরীতে আমার উপন্যাসকে দাঁড় করাতে চেয়েছি। আমি পুলিশের সরকারের আদালতের নথির একটা অক্ষরও না বদলে তাদের নথির কাহিনীর অর্থের বিকল্পহীন নির্দিষ্টতার বিরুদ্ধে আমার কাহিনীর অনির্দিষ্টতাকে খাড়া

করেছি। .....আমি পুলিশের, সরকারের, আদালতের আইনী অর্থ সর্বস্ব শব্দের বিপরীতে উপন্যাসের কল্পনা সর্বস্ব শব্দকে স্থাপন করতে চাই।"৩৫

এভাবেই একই কাহিনি নথিভুক্ত হয়েছে, একই কাহিনি উপন্যাসে এসেছে। কেউ কারও সীমানা অতিক্রম করেনি। অতিক্রম না করে উপন্যাসের কাহিনি, নথির কাহিনি ভিতর অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছে।

"অন্তর্ঘাতই এই বৃত্তান্ত রচনার পদ্ধতি।"৩৬

ডেভেলাপমেন্ট, কনষ্ট্রাকশন আধুনিক সভ্যতার সোপান স্বরূপ। মানুষ এর ভিতর দিয়েই মুক্তি খোঁজে। কিন্তু দেখা গেল তথা কথিত ডেভেলাপমেন্ট ও কনষ্ট্রাকশন কী ভাবে মানুষকে মুক্তির পরিবর্তে মরণের পথে এগিয়ে দেয়। । পুনাসি বাঁধ বা কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে লেখক অগ্রসর হয়েছেন ইউরোপ, রাশিয়ার পথে। লেখক মনে করেছেন, 'ইউরোপের আলোকপর্ব মার্ক্সীয় পর্বে মিশে ভাবনার কর্মময় ভিত গড়ে তোলে। সম্ভবত, নির্ভুলতা সেখানেই আছে।"৩৭

সংশয় রয়েই যায়, তাই আবার বলেন "সে মুক্তিও তত মুক্তি নয়। আলোকপর্বের বিজ্ঞান যে ডেভলাপমেন্ট ও কনষ্ট্রাকশনে বিশ্বকে গেঁধে ছিল তারও ফলে জার্মানিতে নাৎসিতন্ত্র তৈরি হতে পারে। মার্কসবাদের বিজ্ঞান যে ডেভেলাপমেন্ট আর কনষ্ট্রাকশনে বিশ্বকে গড়ে ফেলেছিল তারও ফলে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এক নষ্টতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে। 'মানুষকে মানুষের মুক্তি খুঁজতে হবে।'"৩৮

এ বৃত্তান্তে সেই মানুষের মুক্তির খোঁজ , সে খোঁজই চলতে থাকবে বৃত্তান্তের পর বৃত্তান্তে— পরবর্তী রচনায়, তিস্তাপারের বৃত্তান্তে, তিস্তাপুরাণে।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত :

'তিস্তাপারে বৃত্তান্ত' তিস্তার দিগন্ত প্রসারিত জলরাশির মতই বিশাল বিস্তৃত পটভূমিতে রচিত এক মহাকাব্যোপম উপন্যাস। তিস্তা থেকে ডায়না, গাজোল ডোবা থেকে ফুলবাড়ি বিশাল ভূ-খণ্ডে, ধূর্ত জোতদার গয়ানাথ, নাউছার আলম, এককালের নকশালিয়া জরিপ-অফিসার সুহাস, তার সহযোগী প্রিয়নাথ, এম এল এ সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার, হাটের লোকজন, বিভিন্ন পেশার দোকানী, ক্রেতা, রাজবংশী, ভাটিয়া, মদেশিয়া, চা বাগানের শ্রমিক, বাবু, চরুয়া, কৃষক সমিতির সংগ্রামী লোকজন, সীমান্তের সীমান্তরক্ষী বাহিনী, রাজবংশী নেতা পঞ্চানন মল্লিক, বীরেন বসুনিয়া, তিলক, সম্পৎ রায়, গয়ানাথের জোয়াই আসিন্দির, শ্রীদেবী ও শ্রীদেবীর ফাংশানের ব্যবস্থাপক, পুলিশ প্রশাসন, আসাম থেকে পুর্ণিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে আসা দর্শক, ব্যারেজের

উদ্বোধনের সময়ের মন্ত্রী, আমলা, লাখো জনতা এবং তিনটি বিশেষ চরিত্র—'গয়নাথের মানষি বাঘারু, মাদারি ও মাদারির মা যাদের দারিদ্র্য আমাদের প্রচলিত দারিদ্র্যের সংজ্ঞায় মেলে না'।

এতো চরিত্র সমাবেশে ব্যাপক পটে — সম্পূর্ণ দেশীয় রীতিতে, ছোট ছোট এপিসোডে বিন্যস্ত ও অনুপুঙ্খ বর্ণনার প্রাচুর্য্য,—রাজবংশী কথোপকথনে বহুস্বরিক— এ উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের ধারায় অদ্বিতীয় ও অনুপম।

এতোদিনে দেবেশ রায় যেন তাঁর অভিপ্সিত ফরম খুঁজে পেয়েছেন। পরিশিষ্টের একটি অধ্যায় সহ সমগ্র উপন্যাসটির ছটি পর্বে দু'শ ঊনিশটি অধ্যায়। আদি পর্বে 'গয়ানাথের জোত জমি' অংশে ক্রান্তির হাটের জরিপ অফিসার সুহাস তার সহযোগী প্রিয়নাথদের নিয়ে হাল্কা ক্যাম্প বসায়। ৬৮'র বন্যার পর বিধ্বস্ত তিস্তাপারের জমি জরিপ করে — তিস্তা ব্যারেজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহন করা এর উদ্দেশ্যে। এই জরিপের কাজে এসে হাজির হয় ধুরন্ধর গয়ানাথ। তার সুচতুর বাক্য বিন্যাস ও জমি মাপার ছলাকলা সুহাস ধরে ফেলে। গয়ানাথের জমি জরিপের সূত্রেই আবির্ভাব ঘটে - বাঘারুর। সারা উপন্যাস জুড়ে — যার বিবরণ, যার দারিদ্র্য, অস্তিত্বহীনতা, সহস্র নেতি পাঠককে শুধু ভাবায় না, লেখকের উপন্যাস সৃষ্টির লক্ষে সেই হয় আসল শক্তি।

জরিপের সূত্র ধরেই আসে কৃষক সমিতির রাধাবল্লব, হৃষিকেশদের কথা। জরিপ সম্পর্কে তাদের অভিমত। চা বাগানের শ্রমিকরাও ঘটনাক্রমে এসে হাজির হয়। কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে দখল নিয়ে কিঞ্চিৎ সংগ্রাম সংগঠিত হয়। অবশেষে স্থাপিত হয় ঐক্য। সেই সূত্রে এম এল এ-র উপস্থিতি — ঘটনাটিকে পুরোপুরি রাজনৈতিক করে তোলে। এম এল এ সাহেব আর একটি রাজনৈতিক কাজে ফুলবাড়ির দিকে চলে যান। তাঁকে পিঠে করে নদী পার করে দেয় 'গয়ানাথের মানষি' বাঘারু। পথে এম এল এ-কে বলে তার জন্মকথা, তার নামের কথা। একটা মানষির নাম চায় সে।

দ্বিতীয় পর্ব, বনপর্ব 'বাঘারুর নির্বাসন' অংশে এম এল এ ফুলবাড়ি থেকে ফিরে এসে নানা কথার মধ্যে গয়ানাথের সঙ্গে আলাপ চারিতায় বাঘারুর প্রসঙ্গ আনে। এম এল এ-ই গয়ানাথের কাছে বাঘারু যাতে আধিয়ারি স্বত্ব পায় তার কথা বলেন। কিন্তু গয়ানাথ বোঝে বাঘারু বোধহয় এম এল এ -কে এ ব্যাপারে বলেছিল। ভুল বুঝে গয়ানাথ বাঘারুকে ডায়নার চরে নির্বাসনে পাঠায়। পরদিন সূর্যাস্তের আগেই সে নির্বাসন ভূমির দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে সে মোষ গরুর বাথানের দায়িত্ব পায় এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা করতে থাকে। এই অংশে

বর্ণিত হয় ডুয়ার্সের বনান্তরালে বাথান ব্যবস্থা, কৃষি ব্যবস্থার ছবি। বাথানের প্রয়োজনীয়তা। মিলিটারি ক্যাম্পে দুধ সাপ্লাইয়ের নানা কথা।

তৃতীয় পর্ব 'চর পর্ব' —'নিতাইদের বাস্তু ত্যাগ ও সীমান্ত বাহিনীর সীমান্ত ত্যাগ' অংশে বর্ণিত আছে তিস্তার ভয়ঙ্কর বন্যার ছবি। কী করে তিস্তায় বন্যা এসে চর গুলিকে ডুবিয়ে দেয়। চরের মানুষ বাঁধে গিয়ে আশ্রয় নেয়-তার কাহিনি। তেমন একটি চর নিতাইদের চর। তাদের চর ডুবে যাওয়ার আশঙ্কায় রাত জাগা — চরের মানুষকে, গরুবাছুরকে পঞ্চায়েতের লোকজন মিলে বাঁধে তোলে। অবশেষে বন্যা এলে সরকারী ত্রাণের ব্যবস্থার কথা বর্নিত হয়েছে। এছাড়া এই বন্যা তো রংধামালী বা দোমোহিনীতেই থেমে থাকে না। চলে যায় বাংলাদেশ সীমান্তে। সেখানে ভারতের সীমান্ত চৌকি-জলে ডুবে গেলে তারা আশ্রয় নেয় বাংলাদেশের সীমান্ত চৌকিতে। অতিথি সমাদরে সেখানে তারা থাকে। বন্যা কী করে দু'দেশের মানুষকে এক করে দেয় তার কথা এ অংশে জানা যায়। আবার নিঃসঙ্গ গৃহহীন দেশহীন একটি মেয়ে ভেজা শরীরে কিভাবে ধর্ষিতা হয়-সে কথাও বর্ণিত হয়েছে এ অংশে।

চতুর্থ পর্ব 'বৃক্ষ পর্ব' বাঘারুর প্রত্যাবর্তন অংশেও বন্যারই ছবি। তবে এখানে বাঘারুর উপস্থিতি ' বৃক্ষ বাহন' বাঘারু একটি বড় বিষয়। আপল চাঁদ ফরেস্টের গাছপালা বন্যার জলে উপড়ে ফেলছে দেখে গয়ানাথ বাঘারুকে ডায়ানার চর থেকে নিয়ে আসে এবং চারটি গাছ এক সঙ্গে বেধে বাঘারুকে তাতে আরোহী করে গাছ রক্ষার জন্য বন্যার জলে ভাসিয়ে দেয়। প্রবল জলস্রোতে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বাঘারুর গাছ এসে থামে নিতাইদের চরে ভাসমান এক টিনের ঘরের চালে। সেখান থেকে সরকারি তত্বাবধানে - কাদা খোয়ার সাহায্যে বাঘারুকেউদ্ধার করে বাঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে কাগজের লোক, রেডিও, টিভির লোকেরা - নেংটি পড়া বাঘারুর ছবি তুলতে থাকে।

পঞ্চম পর্ব 'মিছিল পর্ব' - 'উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্যদাবি' অংশে রাজবংশীদের অতীত গৌরব বর্তমান বঞ্চনা ও স্বতন্ত্র কামতাপুর রাজ্য আদায়ের কথা উল্লেখ করে - বিস্তৃত আলোচনা। তাতে এসেছে উত্তরখণ্ড আন্দোলনের কর্মসূচি, সম্মিলন, তাতে বিভিন্ন নেতার বক্তৃতা, গৃহীত কর্মসূচি। এই অবকাশে শ্রীদেবীকে নিয়ে একটি বড়ফাংশনের বিস্তৃত বর্ণনা। ফাংশনকে সামনে রেখে উত্তরখণ্ড সম্মিলন বাতিল করার উদ্দেশ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক দল গুলির প্রচেষ্টা, সার্কিট হাউসের মিটিং। হাস্যকর জল্পেশ অভিযান। রাজবংশীদের নিয়ে উত্তরখণ্ডের তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন বাতিল করার উদ্দেশ্যে মিছিল। বামফ্রন্টের মিছিলের দ্বারা সে মিছিল

বিধ্বস্ত।

রাজবংশীদের কথা বলতে গিয়ে লেখক রাজবংশীদের জাতি উপজাতি পরিচয়ও দিয়েছেন।

ষষ্ঠপর্ব 'অন্ত্য পর্ব' ' মাদারি মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র' অংশে মাদারি ও মাদারির মায়ের দুঃখ জর জর জীবন বৃত্তান্ত। যে জীবন দারিদ্র্য সীমার নিচে সংজ্ঞার সঙ্গে মেলে না। বহু পুরুষের সহবাসে বহু সন্তান লাভ করেও কোন সন্তান তার কাছে থাকে না। শেষ সম্বল মাদারি। সেও হারিয়ে যায় তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ভিড়ে।

সামনে নির্বাচন। তাই কাজ শেষ হতে না হতেই তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনের আয়োজন। উত্তরখণ্ডের বিরোধীতার জবাব, উন্নয়নের প্রতীক এই তিস্তা ব্যারেজ। লক্ষ লোকের সমাবেশে মাদারির মা ও মাদারিও এখানে উপস্থিত হয়।

এখানেই হারিয়ে যাওয়া মাদারি ও ঝাণ্ডাহীন, দলহীন বাঘারুর সঙ্গে দেখা হয়। পুলিশ এ ব্যবস্থা করে। আর এখান থেকেই এই মানুষের তৈরি নদীকে, বনকে, উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করে ওরা দু'জনে নতুন বন, নদীর সন্ধানে হাঁটতে থাকে।

পরিশেষের দু'শ ঊনিশ অধ্যায়ে আছে 'এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ।' নদী বদলাবে, বন বদলাবে, পরিবেশ বদলাবে কিন্তু প্রাকৃতিক অরণ্যের পশুপাখি, বাস্তুহারা হবে। ব্যারেজের জলে শুখা জমি সরস হবে। অধিক ফলন হবে। গয়ানাথ, হৃষিকেশদের দূরত্ব কমবে। এমনও হতে পারে ওরা ফসলের অধিক দাম পাওয়ার দাবিতে বা আরও নানা দাবিতে এক সাথে রাস্তা রোকো আন্দোলন করবে। কিন্তু বাঘারু মাদারিদের কি হবে?

লেখকের বিশ্বাস - মাদারির মা ঐ একা ঘরে থাকতে থাকতে একদিন ধুলোয় মিশে যাবে। আর মাদারি ও বাঘারু এই প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে হাঁটতে থাকবে- হাঁটতেই থাকবে। তাদের এই চলা চলতেই থাকবে আর এক বৃত্তান্ত শুরু না হওয়া পর্যন্ত।

মফঃস্বলি বৃত্তান্ত, আত্মীয় বৃত্তান্ত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, সময় অসময়ের বৃত্তান্ত লিখে বৃত্তান্ত পর্বের সমাপ্তি ঘটলেও দেবেশ রায়ের তিস্তা পারের মানুষের কথা বলা শেষ হয় না। তিস্তপারের বৃত্তান্ত বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে দেবেশ রায় বলেছেন — "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত লেখার পর আমার মনে হয়েছিল কতটা না লেখা থাকে। লেখাটা খানিকটা এগোনোর পর লেখাটাই অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে, আকার বাদে। তাতে আমার মনে হয়েছিল

যে অনেক কিছুই লেখা হল না। লেখা হলো না, কিন্তু তাতে গল্পের খানিকটা ধাঁচ থাকে, আকার থাকে। তাতে একটা সম্পূর্ণতার দিকে যেতেই হয়। আমি ইচ্ছে করলেই তো একটা লিখতে পারি না। ফলে প্রায় ২০ বছর পরে আমি বোধহয় ' তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র চেয়েও একটা বড় উপন্যাস লিখেছি, বেড়িয়েওছে 'তিস্তাপুরাণ'। কিন্তু মজা হচ্ছে এটা লেখার পরও মনে হচ্ছে যে তাও যেন কিছুই লেখা হলো না। আর লিখব কিনা জানি না, কিন্তু লেখার যা ইচ্ছে ছিল তার অনেকটাই বাকি আছে।''৩৯

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি তিস্তাপারের বৃত্তান্ত লেখার পরও তিস্তাপারের মানুষজন, প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা বাকি রয়ে গেছে। তাই বাকি অনেক কিছু নিয়েই রচিত হয়েছে 'তিস্তাপুরাণ'। তিস্তাপুরাণ পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র প্রায় ২০ বছর। কেন এতো সময় লাগল তার উত্তর তিনি দিয়েছেন এভাবে—''আমি ইচ্ছে করলেই তো আর একটা লিখতে পারি না।' এই সময় ক্ষেপণের আরও আরও কী কী কারণ সে সম্বন্ধে আমরা কিছু অনুমান করতে পারি। প্রথমত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র চেয়েও আরও উন্নত কাঠামোর পরিকল্পনা। কারণ 'অনেক কিছু' লেখার জন্য যে আধার দরকার হয় তা তিস্তাপারের বৃত্তান্ততুল্য আধারে আটবে না। সেই আধারটি হলো 'পুরাণ'। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তিত রাজনীতি — যা তিনি তিস্তাপারের বৃত্তান্তের পরিশিষ্ট অংশে দেখিয়েছেন তার গতি প্রকৃতি অনুসন্ধান করা।

তিস্তাপুরাণঃ

এর পর্ব সংখ্যা সাত। সাতটি পর্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে করা হলো—

১) 'শেষ'— ধূপগুড়ি থেকে, গয়েরকাটা থেকে অদূরে বন-পাহাড়-দশ নদী-বিশ নদীর বুড়িমা জুবু থুবু কর্মহীনা। 'বুড়িমা যেন ঝিনঝা কাঠির ঠাকুর — তার চোখ-মুখ-কান সবই আছে, দেখে দেখে সব বুঝতে হয়। তার কোন আওয়াজ নেই, তার কোন চলন নেই।' তবুও তার উপস্থিতি সংসারে সাদরে স্বীকৃত। তার ঘর আছে। সব ঘরই তার ঘর। তার অস্তিত্ব মিশে আছে পাঁচ-ছ পুরুষের বিস্তৃত এই সংসারে। ছেলে, ছেলের বউ, তার ছেলে, নাতি, নাতির নাতি বা নাতনি এভাবেই তার গোতের বিস্তার। যখন যার ঘরের সামনে সন্ধ্যা হয় — তখনই সেই ঘরে সে ঢুকে পড়ে, রাত কাটায়। এভাবেই সে বেঁচে আছে পাহাড়ের মতো, নদীর মতো। অবশেষে সে সমুদ্র হয়ে গেছে। সেই জন্যই তার গোত বিস্তৃত ও বিশাল। এতবড় গোতের কর্মকাণ্ডও বিশাল। ছয় এগিনা যুক্ত বিশাল বাড়ি ঘর রাজবংশী আদলে তৈরি। চাষ আবাদের ব্যাপক আয়োজন। বিশেষত শ্রাবণ মাসের শেষ কুড়ি দিনের ব্যস্ততা — চাষী মাত্রেরই জানা। তারই মধ্যে একদিন মুখটাটু কানকাটুর বউ খেয়াল

করে বুড়িমা নেই। শুরু হয় খোঁজা। এগিনা, জঙ্গলবাড়ি, জোতবাড়ি সর্বত্র খোঁজা হয়। বাড়ির বউ ছেলে মেয়ে সবাই চারদিক খুঁজতে থাকে বুড়িমাকে। অবশেষে কত কল্পনা, কত আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে বুড়িমাকে পাওয়া যায় ' সানঝুর বড় ছেলের ঘরের ঝাপের আড়াল থেকে বের করে আনে কাল্টি।'

এই বুড়িমা একদিন এক ভাদ্রের দুপুরে দুখারুর পুত্রবধূ ঢলানীকে আঙুল তুলে ডেকে বলে ' পাহাড়ের ধসে বান আটকি আছে, পাহাড়ত, উচাঁপাহাড়ত, বড়বান, বড়বান—'। বুড়িমার দিব্য দৃষ্টিতে দেখা ঝুলে থাকা বড় বানা যে কোন মুহূর্তে পাহাড় থেকে নেমে এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিতে পারে। সেই আশঙ্কায় বুড়িমার গোতে একটা সাড়া পড়ে যায় গোলাঘর রক্ষার, পাটা ঘররক্ষার, গোয়ালিয়া ঘর রক্ষার, শোয়া ঘর রক্ষার।

এই ছোটাছুটির মধ্যে চলে আসে জননী কাউঠানি প্রসঙ্গ। এসে পরে তিস্তার পরিচয় — তিস্তাবুড়ি - শিবঠাকুর — মেচেনী আখ্যান। শুরু হয় নদী খোঁজার পালা। বুড়িমার গোতের খোঞ্জন, ফরিঙ্গারা ' ' নদীজানা মানষিক খুঁজিবার যাছি' বলে 'বনপথে নদীপথে' তিনজন তিন দিকে চলে যায়। এই বানা থেকে বুড়িমার গোতের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাঁচাবার জন্যে তিন জোয়ান আর এক বেটিছোয়া গরুর পাল নিয়ে দেশান্তরে চলে যায়।

এতক্ষণ ঘর, গোলাঘর, পাটাঘর, শোয়ারঘর রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুড়িমাকেও উঁচু নিরাপদ স্থানে রাখার যে ব্যবস্থা ছিল তা চুকে বুকে গেছে। এবার কখন বানা আসবে তার প্রতীক্ষা। দিন জাগা, রাতজাগা। বিসারু ভাবে বানা এসে পাটবাড়িতে ঢুকে পড়েছে। ওরা চার পাঁচজন ধানক্ষেতে, পাট ক্ষেতে নামে, আল ধরে হাঁটে। ধান পাটক্ষেতে বন্যার পরিবর্তে বাতাস বয়ে যায়। ওরা পাকা ধান ক্ষেতের মধ্যে বসে যে হল রেখা এখনও মিশে যায়নি সেখান থেকে পুরাণকন্যা উঠে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করে।

২) 'আর এক শেষ' — প্রচলিত সময়ের হিসাবে বানা আসার কিংবা ভাসার হিসাব হয়না। বুড়িমা যখন পাহাড়ে বানা ঝুলে থাকা দেখেছে- তার মানেই হল বানা পাহাড় থেকে নেমেছে এবং সব ভাসিয়েও দিয়েছে। হয়তো এমন হতে পারে বানা সব নদীতে এসে মিশে গেছে। সময়ের দার্শনিক আলোচনা করতে করতে শুরু হয়ে যায় এক ঘাটোয়ালের সোলংগা দর্শনের গল্প।

ঘাটোয়ালের বাবা আর এক ঘাটোয়াল তার বাড়ির উঠোনে সাত কেলেনে পুরনো একটা বড় শিমুল গাছের ভেতর একটা সোলংগা দেখেছিল। শিমুলগাছটাকে কেটে সে একটা আস্ত সোলংগা বের করে। তারপর শোয়ার ঘরে রেখে দেয়। তার ছেলে ঘাটোয়াল একদিন দেখে সেই সোলংগা জলে ভাসছে। তখন সে সেই

সোলংগা ঘাড়ে নিয়ে বের হলো নদীর খোঁজে, জলের খোঁজে, সোলংগা ভাসানোর জন্য। কোন নদীতে সোলংগা ভাসাবে। দুদুয়া, জমজমা, রইপিয়া যে কোন নদীতে সে সোলংগা ভাসায়। সবাই জেনে যায় এক নাইয়া একদিকের সব নদীতেই সোলংগা ভাসিয়েছে। এটা অনিশ্চয়তা ভেবে — মেয়েরা গান গাইতে থাকে 'পরাণ সাধুরে.....' সোলংগা ও নাইয়ার গল্প নদী গুলির মিলনের গল্প। দশনদী বিশনদীর মিলেমিশে যেন একনদী হয়ে গেছে।

জয়বীর পাড়া চা বাগানের নিচে রেতি নদী দু'ভাগ হয়ে যেখানে দুদুয়ায় মিশেছে সেখানে এক আশ্বিনে সোলংগার আরোহী হয় মইনুদ্দিন পাইকার সে নৌকায় করে যাবে জলপাইগুড়ি সদরে মামলা লড়তে। যেতে যেতে নাইয়ার প্রশংসা করে। জিজ্ঞাসা করে তার পরিচয়। কিন্তু নাইয়া তার মা বাবাকে কিছুই বলতে পারে না। তখন মইনুদ্দিনের সন্দেহ হয়, তাকে কী তাহলে ভুলা মাসানে ধরেছে। মইনুদ্দিন নিজে নিজে অনেক কথা ভাবতে থাকে। পাইকার নাইয়াকে জিজ্ঞাসা করে সে নদী হারিয়েছে কিনা। যেখানে যেতে চায় তার নাম জানে কিনা। নাইয়া উত্তর দেয়—দেখলে চিনতে পারবে। সে তিস্তায় যেতে চায়। ঘাটোয়াল পাইকারকে তিস্তায় যাওয়ার আহ্বান জানায়। নৌকা এসে ঠেকে এক চরে। পাইকার সেখানেই নেমে নদী তীরের এক জঙ্গলে ঢোকে। কিন্তু নাইয়াকে ত্যাগ করতে মন চায় না। সে আবার সোলংগায় ফিরে আসে। সিদ্ধান্ত নেয় এখান থেকে আরও ভাটিতে গিয়ে একখানা জঙ্গল পার হয়ে কালীগঞ্জ, জাজং পার হয়ে ময়নাগুড়ির পশ্চিমে তিস্তায় গিয়ে উঠবে। সেই মত ভাটিতে গিয়ে ফরেস্টে প্রবেশ করে। সোলংগা কাঁধে নিয়ে ফরেস্টের পথে যেতে থাকে। টাম গাছের ডাল দিয়ে বৈঠা বানায়। এরপর ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে আসে। এখন জলঢাকা পশ্চিমমাল নদী। জলঢাকায় সোলংগা ভাসিয়ে ওরা ময়নাগুড়ির দিকে ওঠে। তারপর পশ্চিমে হেঁটে তিস্তায় গিয়ে পড়ে।

ওরা বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে তিস্তা দেখছিল। কিন্তু জল কোথায়। সেই স্বল্প ডোবার মত জলে সোলংগা ভাসিয়ে ওরা এক সময় বিশাল তিস্তায় এসে পড়ে।

তিস্তার প্রখর স্রোতে বৈঠা হাতে ঘাটোয়াল সোলংগা বাইতে থাকে। জলের বেগ, নদীর গভীরতা সব মিলিয়ে সে 'বাপের বেটা' বটে। হঠাৎ বৈঠা ফেলে লগি ধরে। মাঝ নদীতে এলে পাইকারের মনে আবার ভয় জাগে— ভাবে তাকে মারার কৌশল করছে বুঝি। সোলংগা একটা কাশিয়ার চরে এসে থামে। এখানে ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানায় পাইকার। পাইকার নেমে পড়ে চরে। ঘাটোয়াল পুরাণ পুরুষের মত নদী খোঁজার জন্য

তিস্তার জলে সোলংগা বাইতে থাকে। এভাবে চলতে চলতে একদিন সোলংগা ফেঁসে জলে ডুবে যায়। ঘাটোয়াল সাঁতার কেটে পাড়ে ওঠে। তার একজন্ম শেষ হলো এভাবে। বনে সে পাতার স্তুপের মধ্যেই শুয়ে পড়ে। তারপর হাঁটতে থাকে। দেখে সামনে এক পাতার ঘর। সেখানে আছে দুই বুড়োবুড়ি। ওই ঘরে ঢুকে পাতার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এদিকে বুড়োবুড়ি ওক্সি পাতার স্তুপ সরিয়ে দুটো 'মাথোয়াল' বের করে। মাথায় দেয়। তারপর 'রাজোবাড়ি চলো' বলে চাল ফুড়ে উড়ে যায়। ঘাটোয়ালও জেগে উঠে ওরকম একটা মাথোয়াল পায়। সেও সেভাবে মাথায় দিয়ে 'রাজোবাড়ি চলো' বলতেই চাল ফুড়ে উড়ে গিয়ে রাজবাড়িতে এসে পড়ে। দেখে স্তরে স্তরে খাবার সাজানো। সে খাবার গুলি তছনছ করে। পানীয় পান করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। কিছু লোক ছুটে এসে তাকে নিয়ে গিয়ে একটা শিমুল গাছের সঙ্গে বেঁধে — আগুনে পুড়িয়ে মারতে চায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তার অন্তিম ইচ্ছা কী? তখন সে মাথোয়ালটা মাথায় দিতে বলে। মাথোয়াল মাথায় দিতেই সে শিমুল গাছ সহ উড়ে গিয়ে তার নিজের বাড়িতে বৌয়ের সামনে গিয়ে নামে। বউ জিজ্ঞাসা করে কোথা থেকে সে এলো। সে উত্তর দেয় ' পর জন্ম থেকে'।

৩) আরম্ভ — বুড়িমার গোতের পরিচয় দিতে গিয়ে তার সন্তানাদির হিসেব আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কেউই বলতে পারে না তার সন্তান কতজন। সে সময়ের কোনো লোক নেই। এমনকি বুড়িমা নিজেও বলতে পারে না। বুড়িমার কত জন্ম বাঁচা চলছে সে হিসেবও কেউ রাখে না। বুড়িমার বাঁচাটা তো আসলে একটা গোটা ফরেস্টের মত বাঁচা। তার একার বাঁচার মধ্যে কত জন্ম মৃত্যু মিশে আছে। সন তারিখ হিসেব করলে বুড়িমার বয়স 'আশি' 'একশ'-র মধ্যে। তার শক্তি নিহিত আছে তার মাতৃত্বে। নারী তার মাতৃত্বের শক্তিতে গোত সৃষ্টি করে। যে একটা শরীরের ভিতর আর একটা শরীর ধারণ করতে পারে তার কাছে বানা ঝুলে থাকার কথা, হাতি ডুবে যাবার কথা আগাম বলতে পারা কী এতই কঠিন ব্যাপার।

একজন মায়ের কাছে আত্ম-পর বলে কিছু নেই। ' যাক কহিছেন পরের ব্যাটা/ উমরায় মোর জাতে খোটা।' এভাবেই গড়ে উঠেছে বুড়িমার গোত আপন পর সবাইকে নিয়ে।

'সবকিছুর পেছনে' অবস্থিত এই বুড়িমার গোতে ' খাশ জমির দখল নিয়ে' যে 'একটা আওয়াজ উঠেছিল' তা পৌঁছে যায়। পৌঁছে যায় এর ওর মুখে, স্বাভাবিক নিয়মে। এই গোত ১৯৬৪-৬৫ সালে খরার পাকে পড়ে। ফসল দারুণ ভাবে মার খায়। তবু তারা লেভির কথা শুনতে পায়। প্রয়োজন হয় খোঁজ খবরের। অগুন ময়নাতলীর হাটে যায় ছোটু মিঞার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করতে। আরও ভালো জানার জন্য ছোট দাদা ব্লক

অফিসে যায়। ব্লক অফিসে শহুরে একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। নানা কথাবার্তায় তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করে। বাড়ি ফিরে এসে শুরু হয় 'শলা পরামর্শ'। বাঙ্কুরাম স্পষ্ট জানায়, এই লেভির মধ্যে 'পাট্টিপুট্টি'র কোন ব্যাপার আছে। এর মধ্যে এ ব্যাপারে ধূপগুড়ি হাটে মিটিংও আছে। সিদ্ধান্ত হয় মিটিংএ গিয়ে দশদিকের দশ জনের আলোচনা শোনা দরকার।

হাটে যাওয়ার একটা নেশা ধরে বুড়িমার গোতে। কারণ হাট ঘর থেকে এক মুক্তির জায়গা। বুড়িমার গোতের লোকজন ধূপগুড়ি হাটে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। 'গুহাপথ' দিয়ে বাঙ্কুরাম, ছোটদাদা, নদিনী, অগুন, শাদুরী, দোলন-রা হাটের পথে চলতে থাকে। পথে কুলজুয়ার জলে ভিজে, সাঁতার কেটে ওরা এক সময় হাটে গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রথমে ওরা দেখতে পায় ডাঁই করা হাঁড়ি কলসীর দোকান। সেখানে চুকাই, ঢেক, ঘারা, পোইলা, ঢেকসা নানা রকমের হাঁড়ি-পাতিল দেখে। এরপর গদিয়ালবাবুর দোকানে বসে। লেভির প্রসঙ্গ আসে। বাজারে চালের জোগান অত্যন্ত কম। দরও ৩০০ টাকা কুইন্টাল।

চা- নিমকি খেয়ে ওরা উঠার উপক্রম করতে গেলে গদিয়াল মিটিং শুরু হবে বলে বসতে বলে। 'ক্ষেতোয়াল' কাছুয়া মহম্মদ, টাকু পাইকার, মোটা শিলা জোতদার, ছোটু মিঞা, শশঙ্গি জোতদাররা এসেছে মিটিং-এ যোগ দেওয়ার জন্য লেভির এজেন্ট গদিয়াল ভদ্রলোক কৌশল করে বিডিও সাহেবকে নিয়ে এসেছে। বিডিও সাহেব সাধ্যমত সবাইকে লেভি দিতে বলেন। এদিকে হাটের মধ্যে বাংলা কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি লেভি না দেওয়ার জন্য মিটিং মিছিল করছে।

লেভি নিয়ে নিজেরা আলাপ আলোচনা করে বুড়িমার গোত দু'কুইন্টাল ধান দিতে চায়। কিন্তু গদিয়াল মালিক বলে এতে গোতের মান থাকে না। অবশেষে সতের কুইন্টাল করা হয়। সেও আবার গদিয়ালই দিয়ে দেয় — ওরা গদিয়ালকে টাকা দিয়ে দেয়। সুতরাং এই মিটিং লেভি ছাড়ের মিটিং নয় বরং লেভি দেওয়ার মিটিং। খরার পাকের মধ্যে পড়েও বুড়িমার গোতকে এত লেভি দিতে হল ফলে ওরা ঠিক করে —' ই সরকারক পাল্টিবার লাগে'। এবং যথারীতি পরের ভোটে সরকার পাল্টে যায়।

লেভির কাজকমর্ম্ম সেরে ওরা বাড়ি ফেরে। বাড়ির কাছাকাছি এসে জিজ্ঞাসা করে ' বুড়িমা কেনং আছে? উত্তর আসে ' আছে, আছে, আছে।'

৪) আরম্ভের পর — বুড়িমার বাড়ির লোকেরা সারা দিনে বহুবার বুড়িমার গায়ে হাত দিয়ে দেখে বুড়িমা বেঁচে আছে কিনা। বুড়িমা তো শকুনের ডিমের মত বা দুস্প্রাপ্য লতার মত দুলর্ভ নয়। সেই সবচেয়ে বেশি

সহজ প্রাপ্য। তাকে বাড়ির সর্বত্র পাওয়া যায়। এবাড়ির দৈনন্দিন জীবন, ঋতুভর জীবন এই সবের মধ্যে বুড়িমা জড়িয়ে আছে — তুলসী মঞ্চের পেছনে লতার মত।

'হাতের ছোঁয়াতেই যাকে মৃত বলে জানা যেতে পারে, সে বেঁচে আছে কিনা সেটা জানা হয়ে যাবার পর সে আরও বেশি বেঁচে যায় না?' বুড়িমার শরীরের বেঁচে থাকার জন্য যে তাপ দেয়, সে বুড়িমার শরীর থেকে তাপ নেয়ও।

বাড়ির কোন পুরনো বৌ, বড় কোন নাতনী বা কোনো পুতির বেটি ঘরে এগিনায় যাওয়া আসার সময় বুড়িমাকে একটু ছুঁইয়ে দিয়ে যায়। কোনো ঘরে বুড়িমা ঢুকে থাকলে পুরনো বৌ দু'হাতে তার গাল ধরে আদর করে। উত্তাপ দেয়, নেয়। নতুন বৌয়ের ঘরে ঢুকলে, কেউ বাইরে থেকে বলে দেয় 'থাকুক, থাকুক।' বুড়িমা তো এ গোতে বুড়িমা হয়েই আসেনি। এসেছে বৌ হয়ে। সেদিক থেকে সে তো অন্য সংসারের মানুষ। তাই ইচ্ছে করলে সেও চলে যেতে পারে। একটা অনিশ্চয়তা। বুড়িমা যেন সাইটোন দেবী। তাকে বাঁজার লজ্জা যাতে পেতে না হয়, বনবাসে যেতে না হয়, তাই তাকে ছোঁয়া, তাকে বাঁচিয়ে রাখা।

৫) আর এক আরম্ভ — সেবার বুড়িমার দশনদী বিশনদীর পৃথিবীতে মনে হয় এক নি-ছাড়নি বর্ষা শুরু হয়ে গেল যার ফলে ফলনের হিসেব সব গোলমাল হয়ে গেল। বর্ষার আগের ফলন, বর্ষার সময় ও পরের ফলন সব কখন কোনটা সব যেন গুলিয়ে গেল। বর্ষার সময় বৃষ্টি ছাড়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। একবার শীতও নাকি এরকমই দীর্ঘ ও তীব্রতর হয়েছিল। সেই জমি দখল টখলের সময় ওই বর্ষা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের যুদ্ধের পর যে ভাটিয়া ওদেশ থেকে এসে এখানে বসবাস শুরু করেছিল। তারা জলচাষ জানত। তারাই এখানে জলচাষের সূচনা করে। জলচাষ মানে যে চাষে প্রচুর জল দরকার হয়। জমিতে জল দিতে হয়। আবার বেরও করে দিতে হয়। এটা হাইইল্ড চাষ। বিঘায় ১৫-২০ মন ধান হয়। ব্লক অফিস থেকে বীজ ধান এনে বিছন করে ঘন ঘন করে লাইন করে চারা লাগাতে হয়। তিন মাসের মধ্যে ধান পেকে যায়। বৃষ্টির ফলে এই জলচাষ করার সুবিধাও হল। অবশ্য জলা জায়গার পাশেও এচাষ চলে।

ঋতু বিপর্যয়ের ফলে দেখা দিল ভূমি বিপর্যয়। মাসের পর মাস জলে ডুবে থাকা মাটির রং বদলে যায়, গন্ধ বদলে যায়। ছোট ছোট মাছে মাখামাখি মাটি কোন চাষের উপযোগী তা ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এক সময় বর্ষাও থেমে যায়।

তখনও বুঝে ওঠা যায় না এটা কোন মাস চলছে এমনকি কোন ঋতু। দেখা যায় নাম বিপর্যয়। মাসের নাম,

ঋতুর নাম সব গোলমাল পাকিয়ে যায়। সূর্য উঠলেও বোঝা মুশকিল এটা আশ্বিন মাস না ফাল্গুন মাস। বর্ষার পর ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। তা থেকে শীতও অনুমান করা যায়। বর্ষা শেষ হলে একটা জিনিস বেশ লক্ষ্মণীয় তা হল গর্ভধারণ। বর্ষাটা যেন গর্ভধারণেরই সময়। গর্ভধারণ মানে তো প্রসবও। আর তাদের ছেলেদের নামও হয় ঝরণ, ঢেপা, জংলু, সিমুলিয়া। ঝরণ বৃষ্টি অনুসারে। ঢেপা বৃষ্টির বিপরীতে। বাংলাদেশ থেকে আসা দুদুয়ার ভাটিয়ারা এরই মধ্যে নতুন চাষ শুরু করে। আধিয়ারি লিস্টে তাদের নামও ঢুকানো হয়।

দুদুয়ার ভাটিয়ারা তাদের চাষবাস হয়ে গেলে বেরিয়ে পড়ে। দেখা শুনাও হয় সবার সঙ্গে। এভাবে ওরা সবার চেনা হয়ে যায়। তারা সবাই ভাটিয়া চাষ দেখায়। এখানকার প্রচলিত চাষের বাইরে নতুন ফলনের — আলু, টমেটো, কুমড়ো ইত্যাদি চাষ। দশ-বারো বছর পর দশনদী বিশনদী অঞ্চলেও এই সব চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন বর্গাও শুরু হয়। বর্গা লিষ্ট তৈরি হয়। কিন্তু আধিয়াররা ভয় পায়, এতে কি সুবিধা তারা বুঝতে পারে না। শশঙ্গি জোতদার দেশি আধিয়ারের চেয়ে ভাটিয়া আধিয়ারকেই বেশি পছন্দ করে তাদের নাম লিষ্টে দিয়ে দেয়। তাতে দেশি আধিয়াররা ক্ষেপে ওঠে। পরে ভাটিয়া আধিয়াররা নিজেরাই তাদের নাম কাটিয়ে নেয়।

ভাটিয়ারদের দ্বারা নতুন চাষ শুরু হলে আরও নতুন নতুন চাষের খোঁজ চলে। বিডিও অফিসে পাওয়া যায় সেই খোঁজ। বর্ষা ও শীতের শেষে — ক্ষেতবাড়িকে নতুন চাষের উপযোগী করা একটা অভিযান।

শুরু হয়ে যায় উপদেষ্টা খোঁজা। ব্লক অফিস থেকে চেয়ে পাঠানো হয় একজন চাষ জানা উপদেষ্টাকে। দুদুয়ার চাষিদেরও বুড়িমার গাঁও- এ নেমন্তন্ন করে আনা হয়। দুদুয়ার ভাটিয়ারা এসে মাটি পরীক্ষা করে দেখে এ মাটিতে ধান চাষ হবে কিনা। ব্লক অফিসে হাইইল্ড ধান চাষের পরামর্শ পাওয়া যায় সে কথাও তারা জানায়।

এরপর একদিন ব্লক অফিসের বাবুরা এসে বুড়িমার গোতের লোকজনের সঙ্গে হাইইল্ড চাষ সম্পর্কে আলোচনা করে। চাষ বিশেষজ্ঞবাবু জমিতে কতদিন জল রাখতে হবে কত দিন শুকনো রাখতে হবে সে বিষয়ে জ্ঞান দান করেন।

নদীর পারের একটা জমিতে 'হাইলে'র চাষ শুরু হয়ে যায়। ওরা তাদের জানা সমস্ত বিদ্যা উজার করে চাষ শুরু করে। ধান গাছও জঙ্গলের মত হয়। কিন্তু তাতে শীষ বের হয় না। ওদের মাথায় বাজ পড়ার উপক্রম। ওরা বিডিও অফিসে যোগাযোগ করে জানতে পারে জমিতে হয় সার বেশি দেওয়া হয়েছে নয় তো কম।

ধানজ্বর প্রতি বছরের মত এবছরেও এলো। রোয়াগাড়ার সময় এ জ্বর শুরু হয়, ধান কাটার সময় পর্যন্ত চলে। একে একে বাড়ির প্রায় সবাই এ জ্বরে আক্রান্ত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিমপাতার রস খেয়েই এ জ্বর সেরে যায়।

ধানজ্বরের মত এবার ম্যালেরিয়া এসে বসল। খেতুয়া, ছোটবাপা, সোমারীরা, ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ল। হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে খাওয়াতে লাগল বাড়ির লোকেরা। এব্যাপারেও ব্লক অফিসে স্প্রে করার ওষুধ পাওয়া যায়।

হাইইল্ডের পাশাপাশি তামাক চাষের মত একটা পুরোনো চাষ চালু আছে বুড়িমার গোতে। ঢেমনার ডাঙ্গির মাঠের এক অংশে তামাক চাষ শুরু করে। এই তামাক ক্ষেতে তামাক চাষ করতে করতে ঢেমনার জ্বর আসে। এবং তামাক ক্ষেতের পাশে এক পাটকাঠির পুঁজে মারা যায়। আকাশের শকুন ওড়া দেখে বাড়ির লোকেরা গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় পায়। সেই ঢেমনার মুখাগ্নি করে বড়দাদা। ঢেমনা বুড়িমার গোতের কেউ না হয়েও গোতের একজনের মর্যাদা পায়। যেন পুরাণ পুরুষ।

৬) শেষান্তর— বুড়িমা গোত্রনারী। বুড়িমা থেকেই একটা গোত তৈরি হয়েছে। সাধারণতঃ গোত তৈরি হয় অনেক পরে। মানুষেরা তাদের নিজেদের পরিচয় দেবার জন্য নিশানা হিসাবে গোত তৈরি করে। কিন্তু এখানে বুড়িমার জীবদ্দশাতেই — গোত্র তৈরি হয়ে গেছে। বুড়িমা নিজে ভুলে গিয়ে তার ছেলেকেও ভুলিয়েছে। এই বিস্মরণ থেকেই তৈরি হয়েছে গোত।

সেই গোতে এসেছে পরিবর্তন। এসেছে নতুন চাষ। বদল হয়েছে হাওয়া। বনে, ক্ষেতে যে সব পাখি আসত তারা সময়, পথ বদল করেছে। 'আওয়াজ বদল' হয়েছে। হাইইল্ড ধানের জন্য পাম্পসেটের শব্দ। নতুন শব্দ। ইউরিয়া সারের গন্ধ — এখানে নতুন গন্ধের আমদানি। এছাড়া বুড়িমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা হওয়া। গাড়ি, ভ্যান আসা যাওয়া শুরু করেছে। তারই সূত্রে বুড়িমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে। সেখানে দিদিমণি ছাত্রছাত্রীদের দেখা যাচ্ছে।

শাড়ি পড়া দিদিমণিকে দেখে গোতের মেয়েরাও শাড়ি পড়া শুরু করে। এরই মধ্যে বুড়িমা একদিন দুখারুর পুত বৌ ঢলানিকে ডেকে বলে ' তিস্তার পারে' হাতি ডুবে যাবার ধরিছে। সেবা দে সেবা দে।' বুড়িমা যখন বলেছে হাতি নিশ্চয় ডুবছে। তাই সেবা দেওয়ার জন্য বুড়িমার গোত সেবার সামগ্রী জোগাড় করতে থাকে। নতুন কুলো বানায়। নতুন কলা পাতা, কলাগাছ কেটে টুকরো করে। পরের দিন তারা যাত্রা করে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ময়নাতলি যাওয়ার বাসে ওঠে। বাসেই টিকিটোয়াল ছেলেটির মুখে হাতি ডোবার স্থানটির নাম জানতে পারে। পুরনো বার্নিশের কাছে চরে হাতি ডুবে যাচ্ছে।

ডুবন্ত হাতিটা একটা কানজি হাতি। হাতি ডোবার স্থানে পঞ্চায়েত থেকে একটা প্লাষ্টিকের চাদর টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দর্শকের এত ভিড় যেন মেলা বসেছে। আমলাতান্ত্রিক কিছু অসুবিধায় ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করা যায়নি। হস্তি বিদ্যার নানা দিক আলোচনা করে শেষে সিদ্ধান্ত করা হয় যে —কানাজি নিজেই পাতাল প্রবেশ করবে বলে নদী দেবতার কাছে এসেছে।

বুড়িমার গোত সেই যে ভাদ্রের গোড়াতে হাতি ডোবার স্থানে এসেছে সেই থেকে আছে। হাতিকে সেবা দিয়েছে। প্রতীক্ষা করছে কবে হাতিটি সম্পূর্ণ ডুবে যাবে। কানজির হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাওয়ার দিন জোরপাকড়ির কোটকা জটাইয়ের নাতির সঙ্গে বুড়িমার গোতের শনিয়ার বিয়ে হয়ে গেল।

এই হাতি ডোবার মেলাতেই একদিন বড়দাদা ছোটদাদাকে দেখতে পায়। তাকে পেয়ে বুড়িমার গোতের সে কি আনন্দ। আবার তাকে গোতে ফিরে যাবার কথা বলে সবাই। কিন্তু ছোটদাদা বলে, 'মোর জোতও নাই, গোতও নাই।'

চাঁদের দহন বাড়লে কানজি ডুবে যায়। তিস্তাপারের শক্ত মাটি থেকে হাতির গান ভেসে আসে — 'ও মোর দাঁতাল হাতির মাহুত রে।' হাতির রাজা কানজি ডুবে যাচ্ছে হস্তি কন্যা কিছু করতে পারছে না বলে আক্ষেপ করে গান গায়। ভাদ্রের কৃষ্ণা অষ্টমীর চাঁদ উঠলে হস্তির সারা শরীরে মস্তির নেশা জেগে ওঠে। বিভিন্ন বয়সীরাও নেশাগ্রস্থ হয়ে ওঠে। অন্যান্য হস্তি-হস্তিনীও রমনে মেতে ওঠে। কানজি আপন মনে, আপন রভসে শেষ মস্তি করে নিজেই নিজের সঙ্গে— কারণ তার পাশে তো অন্য কোন শরীর নেই।

হঠাৎ রটে যায় হাতির পুরোটা ডুবতে দু'মাস সময় লাগবে। তাই সবাই বাড়ি ফেরার জন্য 'প্রস্তুতি নেয়। একসময় নজরে পড়ল কানজির পেছনের বাঁ দিকটা ডুবে যাচ্ছে। কানজির মাথা সোজা হয়ে গেল। তারপর একেবারে ডুবে গেল।

এবার সবার মত বুড়িমার গোতও গাঁয়ে ফেরার জন্য তৈরি হতে লাগল। এমন সময় ভ্যানে করে শাড়ি পড়ে শনিয়া ও তার ফুল প্যান্ট পরা বর — এদের খোঁজে আসে। বুড়িমার গোতের লোকেরা ছোটদাদাকে সঙ্গে করে গাঁয়ে নিয়ে যেতে চায়। ছোটদাদা পরে যাবে বলে বাস থেকে নেমে যায়। নেমে শনিয়াকে দেখে। বুড়িমার গোতের মেয়ে তবু চিনতে পারে না। শনিয়াও পারে না। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থেকে

দু'দিকে চলে যায়।

৭) কথান্তর —ছোটদাদা পাঁচ সাত দিনের মধ্যে নতুন পথে গোতে ফেরে। একজীবনের অর্ধেকটা তো তার কেটেছে গোতের বাইরে নির্বাসনে। ফিরতি পথে সে পথের দু'ধারে পরিবর্তন দেখতে পায়। গোতে ফেরা মাত্র গোতের লোকেরা তাকে ঘিরে ধরে। শুনতে চায় তার বাইরের দেশের গল্প। সে গল্প করে, জানায় সব খানেই সে বুড়িমার গাঁওয়ের পরিবেশ দেখতে পেয়েছে। বড়দাদা, বাঙ্কুরাম, বনুয়া, কলিন, অগুনরা তাকে বুড়িমার পরিবর্তন হওয়া ক্ষেত দেখায়। ছোটদাদার মনে পড়ে গরুচুমানি, কার্তিক সংক্রান্তির স্মৃতি।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ছিলিম খেতে খেতে সবাই মিলে নানা রকম রসিকতা করে। এরই মধ্যে উঠে আসে ডাঙ্গির মাঠের প্রসঙ্গ। যে ডাঙ্গির মাঠ দখল নিতে গিয়ে একদিন ছোটদাদাকে নির্বাসনে যেতে হয়েছে— সেই ডাঙ্গির মাঠ এখন ছোটদাদাকে লিখে দিতে চায় গোতের কর্তারা। কিন্তু ছোটদাদা তা স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করে।

নইদারিঘরে একদিন দিনের বেলায় বড়দাদার পাশে শুয়ে সে ডাক শুনতে পায়, গোত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ডাক। এখন গোতের জমিতে এক মনের জায়গায় বিশমন ধান ফলে। কিন্তু 'এতখান ফসল মানষির ক্ষিধার তানে না। টাকার তানে।' তাই সে সেদিন ফিরবে যেদিন ' মানষির হাতের ফসল মানষির পেটের ক্ষিধার মুখত নিগিবার' দরকার হবে। এতে কয়েক জন্ম অপেক্ষাও করতে হতে পারে।

পাছত এগিনায় ঢোকার বাঁকে বুড়িমা আঙুল তুলে ছোটদাদাকে ডাকে তার পিঠে বেধে তাকে তিস্তায় বিসর্জন দিতে। ছোটদাদা বুড়িমার আদেশ মত পিঠে বেঁধে বড় বাঁক, আংরাভাসা নদী হয়ে তিস্তায় বিসর্জন দিতে নিয়ে যায়। বিসর্জনের পর আবার সে সেই পথেই ফিরে আসবে। দু'চার মানব জন্ম পর। এভাবেই পুরাণ শেষ হয়।

তিস্তাপুরাণের বিষয় মূলত রাজবংশী মানুষের জীবনকথা। গোত্রনারী বুড়িমাকে কেন্দ্র করে দশনদী-বিশনদীর দেশে বুড়িমার গোত। সেই গোত অন্তর্গত মানুষদের দৈনন্দিন —জন্ম-মৃত্যু, বেঁচে থাকা, তাদের রীতি নীতি পূজাপরব, বিশ্বাস। নদীকে চেনা— নদী মানষি। এই জীবনচর্চ্চার নিরিখে রাজনীতি। একটা জন গোষ্ঠীর ধীরে ধীরে পরিবর্তন — আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এখানেও উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করে ছোটদাদার বুড়িমাকে তিস্তায় বিসর্জন দিতে চলে গেছে নদী ধরে ধরে। আবার আসবে মানুষের পেটের ক্ষিধে যখন ডাকবে। বিঘেয় ১০-১৫ মন ধানে পেটের ক্ষিধে মিটলেও অর্থের নেশা মেটে না। এ উন্নয়ন ধনতন্ত্রের। মানুষ

-এর সুফল পায় না। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে বাঘারু,মাদারিরা যে উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন ফরেস্ট নতুন নদীর খোঁজে হাঁটা শুরু করেছে, কতদিন হাঁটবে কে জানে। অন্ততঃ গত ২০ বছরের বামফ্রন্ট শাসনেও লেখক তার হদিশ খুঁজে পাননি। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণের মধ্যবর্তী ২০ বছর কমিউনিস্ট প্রভাবিত বামফ্রন্টের শাসন কাল। কিন্তু লেখকের কমিউনিস্ট বিশ্বাসে মানব মুক্তির সম্ভাবনা আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে। তাই বৃত্তান্তের নায়করা পুরাণে এসে অন্য নামে হাজির হয়েছে। লেখকের আশা ছোটদাদা ফিরবে কয়েক জন্ম বাদে। চির আশাবাদী দেবেশ রায়ের এই বিশ্বাস। এই আশা থেকেই 'তিস্তাপুরাণ' পরিকল্পনা ও সমাপ্তি।

।। দেবেশ রায়ের রচনা সম্ভার ।।

দেবেশ রায়ের গল্প সমগ্র ৬ খণ্ডঃ—

দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ১-	দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৯৯, এপ্রিল ১৯৯২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ২-	দেবেশ রায়, রাখি পূর্ণিমা, শ্রাবণ ১৩৯৯, আগষ্ট ১৯৯২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৩ -	দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ় ১৪০০, জুলাই ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৪ -	দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪০১, এপ্রিল ১৯৯৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৫ -	দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৬ -	দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪০৭, এপ্রিল ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায়ের গল্প	প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ১৯৮৮, শাশ্বত লাইব্রেরি, কলকাতা।
দেবেশ রায়ের ছোটগল্প	প্রতিক্ষণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, কলকাতা।
দুই দশক	অন্বেষা, ১৯৮২, কলকাতা।

স্মৃতিহীন বিস্মৃতিহীন — এ, মুখার্জী, কলকাতা।

রক্তমণির হারে (সম্পাদনা) — সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লী ১৯৯৯।

প্রবন্ধ

আঠারো শতকের বাংলা গদ্য ঃ চিঠিপত্রে কিছু নতুন প্রমাণ — প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৮৭।

ঔপনিবেশের সমাজ ও সাংবাদিক গদ্য,

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ নিয়ে কিছু অনুমান — প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯০।

উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজ — দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪।

উপন্যাস নিয়ে — দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১।

তারাশঙ্কর নিরন্তর দেশ — দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৩।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য — কে.পি.বাগচি, কলকাতা, ১৯৭৮।

সময় ও সমকাল — রক্তকরবী, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ও আধুনিকতা

শিল্পের প্রত্যহে — দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯২।

অপর ভাষা — অক্ষর পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪।

উপন্যাস ঃ গ্রন্থাকারে অসংকলিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত

শতরূপা — (প্রথম উপন্যাস, অপ্রকাশিত - ১৯৫৭)

প্রেতাচ্ছায়ে ঘেরাফেরা — (শতরূপাতে লেখা - ১৯৫৬-৫৭)

কালীয় দমন — (সপ্তর্ষিতে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস - ১৯৬১)

অস্তিত্বের গণিত — (৫০০ পৃষ্ঠা মিত্রালয়ে প্রকাশের জন্য দিয়েছেন, কিন্তু হারিয়ে গেছে, খসড়ার সামান্য অংশ আছে - ১৯৬১)

উপন্যাস ঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

মানুষ খুন করে কেন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৭৬।
যযাতি	দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯১।
আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে	বিশ্ববাণী, কলকাতা ১৯৭৩।
বেঁচে বতর্তে থাকা	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮৪।
মফস্বলি বৃত্তান্ত	পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, নববর্ষ ১৩৯৬, এপ্রিল ১৯৮৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০।
স্বামী স্ত্রী	প্রতিভাস, কলিকাতা, ১৯৮৬।
সহমরণ	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ১৯৮৮।
তিস্তাপারের বৃত্তান্ত	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ১৯৮৮।
জীবন চরিতে প্রবেশ	অরুণা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০।
হনন, আত্মহনন	রক্তকরবী, কলকাতা, ১৯৯৩।
সমুদ্রের লোকজন	শারদীয়া বসুমতি, ১৯৮৫
আত্মীয় বৃত্তান্ত	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ১৯৯০।
সময় অসময়ের বৃত্তান্ত	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ১৯৯৬।
শিল্পায়নের প্রতিবেদন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬।
একটি ইচ্ছা মৃত্যুর প্রতিবেদন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৫।
দাঙ্গার প্রতিবেদন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৪।
খরার প্রতিবেদন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৩।
ইতিহাসের লোকজন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯২।
চেতাকে নিয়ে চীবর	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
জন্ম	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৭।
লগন গান্ধার	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৪০১।
তিস্তাপুরাণ	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০০।

দুই দশক	অন্বেষা, কলিকাতা, ১৯৮২।
উচ্ছিন্ন উচ্চারণ	দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৮।
যুদ্ধের ভিতরে যুদ্ধ	দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯০।
আরেকটা কলকাতা	কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা ২০০০।
মারবেতালের পুরাণ	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪।
আঙিনা	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫।
ব্যক্তিগত ও গোপন ফ্যাসিবাদ নিয়ে একটি বই	
স্বদেশ বিদেশ	প্রতিক্ষণ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩।
নভেলজোড়	দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭।

সম্পাদনা ঃ

বিদ্যাসাগর : নির্বাচিত রচনা সমাজ ও সাহিত্য	
দেবেশ রায় ও অশ্রুকুমার শিকদার সম্পাদিত	রাজা রামমোহনপুর, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১।
শত সানু দেশ	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।
ধানের গায়ে রক্তের দাগ	
দীপেন্দ্রনাথ রচনা সংগ্রহ	পরিচয়, কলকাতা ১৯৮৩।
'রূপসী বাংলা' পাণ্ডুলিপি সংস্করণ	
জীবনানন্দ সমগ্র ১২ খণ্ড	
জীবনান্দ সমগ্র ১ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, ১৭ই জানুয়ারি ১৯৮৫
জীবনান্দ সমগ্র ২য় খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৯২, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২৫শে বৈশাখ ১৪০০।
জীবনান্দ সমগ্র ৩য় খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, ২৯শে

	জানুয়ারি ১৯৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৯৫।
জীবনান্দ সমগ্র ৪র্থ খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ ৩১শে জানুয়ারি ১৯৮৭।
জীবনান্দ সমগ্র ৫ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ ১৪ই মাঘ ১৩৯৫।
জীবনান্দ সমগ্র ৬ষ্ঠ খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ১৯৯০।
জীবনান্দ সমগ্র ৭ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ ৩১শে জানুয়ারি ১৯৮২।
জীবনান্দ সমগ্র ৮ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ ৩১শে জানুয়ারি ১৯৯৩।
জীবনান্দ সমগ্র ৯ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ।
জীবনান্দ সমগ্র ১০ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৬।
জীবনান্দ সমগ্র ১১ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৭।
জীবনান্দ সমগ্র ১২ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ।
অন্যান্য ঃ	
তৃপাকে এক তোড়া (আত্মজীবনীমূলক)	কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা ২০০০।
জলের মিনার জাগাও (আত্মজীবনীমূলক)	বারোমাস-এ ১খণ্ড ও আরম্ভ-এ ৩ খণ্ড প্রকাশিত।
প্রতিবেদন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা প্রথম সংস্করণ, ২০০৭।
মিতানকে নিয়ে বাড়াবাড়ি	দোয়েল, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩
বোলে বোলে বোলেরে বোল বিহান	দোয়েল, কলকাতা ২০০৪
দলিত	সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১।

উল্লেখপঞ্জি

১। বারোমাস, ২৭ বছর, শারদ ২০০৫, জলের মিনার জাগাও পৃঃ ৩১৫।

২। তদেব পৃঃ ৩১৫

৩। তদেব পৃঃ ৩১৬

৪। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র প্রথম খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০, পৃষ্ঠা ১২।

৫। বিজ্ঞাপন পর্ব ১৯৮০, পৃঃ ৭৫

৬। তদেব পৃঃ ৭৫

৭। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র তৃতীয় খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, আষাঢ় ১৪০০, পৃষ্ঠা ৯।

৮। বিজ্ঞাপন পর্ব ১৯৮০, পৃঃ ৭৬

৯। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র তৃতীয় খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০০, পৃষ্ঠা ১০।

১০। তদেব পৃঃ ১১

১১। তদেব পৃঃ ১১

১২। বিজ্ঞাপন পর্ব ১৯৮০, পৃঃ ৭৬

১৩। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, পঞ্চম খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ৫-৬

১৪। তদেব পৃঃ ৬

১৫। তদেব পৃঃ ১০

১৬। তদেব পৃঃ ১২

১৭। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, চতুর্থ খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০১, পৃঃ ১৩

১৮। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, পঞ্চম খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ৫

১৯। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, প্রথম খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০, পৃঃ ১১

২০। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৯৯, পৃঃ ৩

২১। তদেব পৃঃ ৭

২২। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, ভূমিকা, তৃতীয় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০০, পৃঃ ১২

২৩। তদেব পৃঃ ১২

২৪। তদেব পৃঃ ১৩

২৫। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, পঞ্চম খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ১

২৬। তদেব পৃঃ ১-২

২৭। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, প্রথম খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃঃ ১১

২৮। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা শ্রাবণ ১৩৯৯, পৃঃ ৭

২৯। পঞ্চাশের দশকের কথাকার, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, কলকাতা ১৯৯৮, পৃঃ ২৩৭।

৩০। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র তৃতীয় খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা আষাঢ় ১৪০০, পৃঃ ১৩-১৪।

৩১। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, পঞ্চম খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ৬।

৩২। বাচন ও স্বনির্বাচন, অরুন সেন, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, কলকাতা ১৯৯৮, পৃঃ ১০১।

৩৩। সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃঃ ২২।

৩৪। তদেব পৃঃ ২৬

৩৫। তদেব পৃঃ ২৮

৩৬। তদেব পৃঃ ২৮

৩৭। তদেব পৃঃ ৩০

৩৮। তদেব পৃঃ ৩০

৩৯। মাধ্যম ও সংযোগ ঃ তৃতীয় বর্ষ ঃ বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০১।